গানের লড়াইয়ে ডুয়ার্সের তিন তারকা

স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন এবং নিজেদের কারখানাই লক্ষ্য ক্ষুদ্র চা-চাষিদের

১০০ বছরে শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল

কোলাখাম পর্যটকদের আমন্ত্রণের খোলা খাম

৪র্থ বর্ষে পদার্পন

এখন ডুয়ার্স
১-১৫ এপ্রিল ২০১৭। ১২ টাকা

দীপায়ন রায়
ঊর্মি চৌধুরী
বন্দনা দত্ত

facebook.com/ekhondooars নিয়মিত পাঠক হলে নাম ও নম্বর পাঠান 9830410808

অত্যাধুনিক জীবনযাত্রা আমাদের জীবনকে অনেক স্বাচ্ছন্দ্যময় করে দিয়েছে, কিন্তু তার সাথে অনেক অসুখও এনে দিয়েছে।
তার মধ্যে কোষ্ঠকাঠিন্য অন্যতম.................

কোষ্ঠকাঠিন্য এড়াতে ৪ টি টিপস্ ঃ-

১. প্রচুর জল খান, প্রতিদিন অন্তত ৩ লিটার।
২. দৈনন্দিন খাবারে ফাইবারযুক্ত খাবারের মাত্রা বাড়ান।
৩. মশলাদার খাবার এড়িয়ে চলুন।
৪. রোজ অন্তত ৩০ মিনিট শরীর চর্চা করুন।

Issued for the public interest by **Pharmakraft**
From the makers of :

PICOME Susp.

আপনি বেঁচে আছেন অমিয়ভূষণ, বেঁচে গিয়েছেন

সম্পাদকের ডুয়ার্স

অমিয়ভূষণ মজুমদার

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত দিল্লির বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী বইমেলায় রীতিমতো মাছি তাড়িয়েছেন কলকাতার তাবড় প্রকাশকের দোকানিরা। প্রবাসী আবেগমথিত বঙ্গসন্তানরা দলে দলে এসেছেন, সারি সারি বইয়ের দোকানের দিকে দৃক্‌পাত না করে সোজা গিয়ে বসেছেন সাংস্কৃতিক মঞ্চের দর্শক আসনে, গানবাজনা শেষ হলে আপ্লুত হয়ে ফিরে গিয়েছেন। উৎসাহী কেউ কেউ অবশ্য এসেছেন, টুকটাক বই উলটেপালটে দেখেছেন, আর হাতে গোনা কতিপয় ব্যতিক্রমী গুটিকয় বইপত্র কিনে বাঙালি বইপ্রেমীদের অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করে গিয়েছেন। দিল্লি বহু দূর, মাস দুয়েক আগের কলকাতা বইমেলাতেও চিত্র সুখকর ছিল না। বহু হতাশ প্রকাশককে ‘এবারই বোধহয় শেষ আসা’ বলতে শোনা গিয়েছে। যদিও ভিড় কমেনি দর্শকের, লেখক-কবি-সাহিত্যিকের। নিন্দুকদের অনেকেই বলেন, ভাগ্যিস খাবারের দোকানগুলো থাকে, তাই তো বইমেলাও বেঁচে থাকে। ‘পেটের দায়’ মেটাতেই নাকি মানুষ বইমেলায় ভিড় জমায়, একদিনের জন্য হলেও বইপ্রেমী বনে যায়! কেউ কেউ আবার ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টার ভূমিকায়— আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই নাকি আয়োজকরা বিজ্ঞাপন দেবেন, ‘এবারের বইমেলায় থাকছে অমুক অমুক দেশ থেকে আসা ফুড প্যাভিলিয়ন ও সেই সঙ্গে সেসব দেশের রান্নাবান্না শেখার ওয়ার্কশপ। আসুন, চেখে দেখুন গোটা বিশ্বকে। আরে দাদা, বই তো ছুতো!’

একশো বছরে পা দিলেন সাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদার। বছর তিরিশ আগে মঞ্চে দাঁড়িয়ে বাংলার আরও কয়েক বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকের উপস্থিতিতে তিনি বলেছিলেন— সাহিত্য আসলে ‘পলায়ন’। জীবনের দুঃখ-জরা-মৃত্যু থেকে পালাতে একদা সাধনায় বসেছিলেন যুবরাজ সিদ্ধার্থ, সাহিত্যের মধ্যে দিয়েও আজকের জর্জরিত মানুষ বোধহয় সেই সুন্দর মুক্তিরই খোঁজ করে। কিন্তু হায়! আজ অমিয়ভূষণ সশরীরে থাকলে দেখতে পেতেন, এখনও একদল বঙ্গজ অক্লান্ত লিখেই চলেছেন গল্প-কবিতা-উপন্যাস, যার উদ্দেশ্য কী জানা না থাকলেও তার পরিণাম যে ‘পলায়ন’ তা অতি সুস্পষ্ট। কারণ, দুর্ভাগ্যজনকভাবে পাঠকের সংখ্যা কমতে কমতে তলানিতে এসে ঠেকেছে। এ সব দেখে-টেখে যে প্রশ্ন তাঁর মনে নির্ঘাত জাগত— সাহিত্য থেকে পাঠক দূরে পালিয়েছে অথচ তা কি ভাবায় না লেখককে? পাঠক ফিরিয়ে আনতে বা তৈরি করতে লেখকের কি কোনও দায়িত্ব নেই?

অমিয়ভূষণের পথ ধরেই তাই সোজাসুজি প্রশ্ন করতে চাই আজকের বাংলার কবি-সাহিত্যিকদের— ভাই, কেন লেখেন? কার জন্য লেখেন? রোজ কবিতা লিখছেন সোশ্যাল সাইটে, প্রকাশিত লেখার ছবি দিচ্ছেন, অথচ আপনি আপনার সীমিত সময় ও ক্ষমতার মধ্যে রোজ অন্যের ক’টা লেখা পড়েন বা মাইনে পেলে ক’টা বই কেনেন? গল্প-কবিতা লিখে জীবিকানির্বাহের কথা আজ ভাবতে পারেন কি? পাঠকের অভাবে যদি কাল বাংলা বইয়ের বিলুপ্তি ঘটে, তবে তার দায় কি আজকের এই ‘শখের সাহিত্য’ এড়াতে পারবে?

একশো বছরে দাঁড়িয়ে অমিয়ভূষণ তাঁর সৃষ্টি নিয়ে উজ্জ্বল উচ্চারিত, আজকের কবি-সাহিত্যিকদের শেখান তাঁর মতোই শিরদাঁড়া সোজা রেখে বাঁচার জন্য। আর সুদূর উত্তরের প্রত্যন্তে বসে যাঁরা ‘সাহিত্য’ করছেন, তাঁদের আর-একবার সচেতন করেন, প্রকৃত স্বীকৃতি-সুনামের জন্য মোটেও কলকাতার মুখাপেক্ষী থাকার প্রয়োজন হয় না, কারণ তার আসল চাবিকাঠি রয়েছে সেই পাঠকের হাতেই।

চতুর্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১-১৫ এপ্রিল ২০১৭

এই সংখ্যায়

সম্পাদকের ডুয়ার্স ৩
উত্তরপক্ষ ৬
ঘরোয়া প্রকৃতিজ পর্যটনের জনপ্রিয়তা
ডুয়ার্সের অর্থনীতিতে নতুন দিশা
চায়ের ডুয়ার্স, ডুয়ার্সের চা ৯
স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠনে সংঘবদ্ধ হোক
ক্ষুদ্র চা-চাষিরা
মুখোমুখি সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি
প্রচ্ছদ নিবন্ধ ১৮
সুপার হিট গানের লড়াইয়ে আসর মাতাচ্ছেন
ডুয়ার্সের তিন ইয়ং স্টার
প্রতিবেশি পাহাড়ের কথা ২২
নতুন জেলা কালিম্পঙে পর্যটকদের
আমন্ত্রণের খোলা খাম
ডুয়ার্স তরাই শতাব্দী এক্সপ্রেস ৩০
শতবর্ষে শিলিগুড়ির বয়েজ হাই স্কুল
ডুয়ার্সের অনাদৃত রতন ৪২
লাটাগুড়ির পরান গোপ

ধারাবাহিক ডুয়ার্স

ডুয়ার্স থেকে দিল্লি ২৪
লাল চন্দন নীল ছবি ৩৬
তরাই উৎরাই ৩৪
ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস ৪৩

শ্রীমতী ডুয়ার্স

আজকের শ্রীমতী ২৭
ডুয়ার্সের ডিশ ২৭

নিয়মিত বিভাগ

সংঘ-সংস্কৃতির ডুয়ার্স ২৯
খুচরো ডুয়ার্স ৪
ডুয়ার্সের ডায়েরি ৩৯
বিচিত্রা ৪১
শিলিগুড়ির রবি ঠাকুর

সম্পাদক প্রদোষ রঞ্জন সাহা
ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদনা শ্বেতা সরখেল
অলংকরণ দেবাশিস রায়চৌধুরী
সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া
বিজ্ঞাপন সেলস সুরজিৎ সাহা
ইমেল ekhonduars@yahoo.com
মুদ্রণ অ্যালবাট্রস,
প্রকাশনা প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস
মুক্তা ভবনের দোতলায়।
মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি
ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।

এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

খুচরো ডুয়ার্স

আমাশা

মাঝবসন্তে দিব্যি শীতের মিঠে হাওয়া। ঝড়-বৃষ্টি-শিলার দাপটে চাষিদের মাথায় হাত পড়লেও মালদার আম চাষিদের হাসি ধরছে না মুখে। অকালবর্ষণের ভালবাসায় আমের দফারফাকারী কীটের দল জব্দ। সুতরাং আম এবার ফাটিয়ে ফলবে। শিলরূপী গোলার আঘাতে ডুয়ার্সের বাঁধাকপি, উচ্ছে, তরমুজ, পটোলরা ধূলিসাৎ হলেও মালদায় গোলা পড়েছে কম। তাই আসন্ন গরমে পাতে ভাতের সঙ্গে সবজির বদলে আমের ঘণ্ট-চাটনি-শুক্তো-ঝোল ইত্যাদি ব্যবহার করার কথা ভাবছেন ডুয়ার্সের গেরস্ত। সবজির যা দাম হবে, তাতে তিন ক্যারেট বিশুদ্ধ পটোল কিংবা পাঁচ ভরি উচ্ছে না কিনে সেরখানেক আম কিনলেই না কাজে দেবে!

তাজ্জব ভূত

ইটাহারের গুলন্ধর গ্রামে এক ধুরন্ধর ভূতের আগমন ঘটেছে। ছায়া-ছায়া চেহারা নিয়ে সে ভূত নিশি নামলেই এর-তার চোখে ধরা দিয়ে মুচকি হেসে ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছে। বেদম ভয়ে গুলন্ধরে আঁধার ঘনালে কেউ বেরুচ্ছে না। পুলিশ নামিয়ে ভূতানুসন্ধান চালানো হচ্ছে জোর কদমে। কিন্তু ভূত ভারী তাজ্জব হে মিঞা! সে নাকি আচমকা শাড়ি কিংবা পায়জামার দড়ি টেনে ভ্যানিশ হয়ে যায়। নেহাত এখন ধুতি কেউ পরে না বললেই চলে। নয়ত কাছা ধরেও টান দিত নির্ঘাত! দুনিয়ায় এত কিছু থাকতে ভূতের চোখ শাড়ি-দড়িতে কেন? কে জানে! তবে জ্যান্ত মানুষের ভূতের সঙ্গে মরা মানুষের ভূতের তো কিঞ্চিৎ তফাত থাকেই, তা-ই না?

চিতার ধার

কালচিনি ব্লকে কয়েকদিন জঙ্গি হামলা চালিয়ে আসা চিতাটিকে সে দিন বন বিভাগের কর্মীরা ফাঁদ পেতে গ্রেপ্তার করে যেই নিয়ে যাবেন, অমনি ঘেরাও শুরু। এলাকাবাসী খাঁচা অবরোধ করে হইহই করে উঠল ক্ষতিপূরণের দাবিতে। সত্যিই তো! এই যে নচ্ছার চিতা ক'দিন ধরে ডজনখানেক হাঁস-মুরগি-গোরু-ছাগল খেয়ে দাম না মিটিয়ে জঙ্গলে ফিরে যাচ্ছে— এর বিহিত করবে কে? চিতার কাছে কি দাম চাওয়া যায়? অতএব, গভ্মেন্ট, তুমি দাম দাও, চিতা নিয়ে বাড়ি যাও। শোনা যাচ্ছে, নয় নয় করে নয় ঘণ্টা আলোচনার পর চিতাবাবুর খাওয়ার বিল মেটানোর আশ্বাস দিয়ে গভ্মেন্টের লোকজন ঘরের বাঘকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়েছে। কী আর করা! চিতার তো আর ক্রেডিট কার্ড নেই রে বাপে! চিতাবাবু অবশ্যি এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি।

ওরা এল ফিরে

ওরা মানে খান পঞ্চাশেক টিচার, ডজনখানেক ডাক্তার, গুচ্ছের ছোট-মাঝারি নেতা সমেত আরও কেউ কেউ। সেই যে কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক থেকে ধার নিয়ে ভ্যানিশ হয়েছিলেন গুণীজনেরা— এদ্দিনে তাঁদের দেখা মিলল গো! সবাই এখন সোনামুখ করে ধারের টাকা ফেরত দিতে লাইন দিচ্ছেন। ডাক্তারদের ধার মেটাতে তাঁদের গিন্নিরা এগিয়ে এসে আঁচল থেকে বার করে দিয়ে গিয়েছে টাকা। কোন এক পৌরসভার কে জানি আধ কোটি ধার নিয়ে ভ্যানিশিং ক্রিম মেখে উধাও হয়েছিলেন, তিনিও নাকি হাসিমুখে আসছেন টাকার ব্যাগ হাতে। দেখে-শুনে ইচ্ছে হচ্ছে, ওদের সামনে দাঁড়িয়ে পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে জিগাই, এতদিন কোথায় ছিলেন? ব্যাঙ্ক তো জলপাইগুড়ি ছেড়ে কোথাও যায়নি ভাই।

বাপ রে

ওদলাবাড়ির ছেলে গিয়েছিল ট্রাক নিয়ে তিস্তা থেকে বোল্ডার তুলতে। ট্রাক গেল ফেঁসে। তুলতে এল ওদলাবাড়ির আরেক ছেলে ক্রেন নিয়ে। এর মধ্যেই জল ছেড়েছে কালিঝোরা ব্যারেজ। বাধ্য হয়ে ক্রেন-ট্রাক নিয়ে নদীর মাঝে উঁচু চরে বসে জল নামার অপেক্ষায় রাত। শেষে জল নেমেছে কি না দেখার জন্য একজন যেই ট্রাক থেকে নেমে লাইটার জ্বালিয়েছে, অমনি রে রে করে তেড়ে এল একজোড়া হাতি। ব্যাস! শুরু হল হাতির সঙ্গে লুকোচুরি খেলা। কখনও চরে গজানো গাছের পিছে, কখনও ট্রাকের নিচে লুকিয়ে হাতির চোখে ধুলো দেওয়া চলল রাতভর। হেরে গিয়ে হাতিরা শেষে ফিরে গেল লাগোয়া অরণ্যে। খুব বাঁচল দুই ওদলাবাড়িয়ান। কী কাণ্ড বলো দিকি! হাতির সঙ্গে লুকোচুরি বুঝলি তো! বাপ রে!

চোরসিক

জলপাইগুড়ির মোহিতনগরের সেই চোর ভারী রসিক বটে! পরপর চার-চারটে দোকানে ঢুকে চুরি করলেও করেছে বেছে বেছে। যেমন কাপড়ের দোকান থেকে কয়েকটা প্যান্ট, পাশের দোকান থেকে বিছানার চাদর তিন-চারটে, তার পাশের

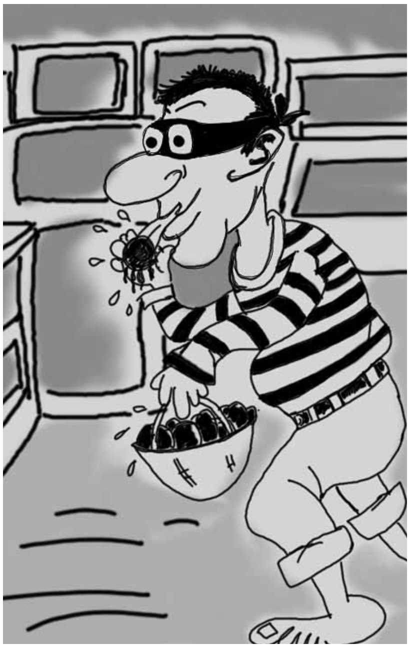

রংধামালির রং

বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল লাগোয়া রংধামালি গ্রামে দোলের দিন ভারী আনন্দ। আগের দিন পাঁঠা কিনে গোয়ালে রেখেছেন গেরস্ত। সক্কাল সক্কাল ‘হোলি হ্যায়’ শুরু করে শেষ করবেন মাংস-ভাতের জম্পেশ ভোজে। কিন্তু ‘হোলি হ্যায়’ শুরু হওয়ার আগে পাঁঠা কেন পরিত্রাহি চেঁচায় ঘরের ভিতর থেকে? সঙ্গে ফোঁস ফোঁস ও কীসের শব্দ? ঘোর সন্দেহ নিয়ে গেরস্ত গিন্নি গোয়ালে উঁকি দিয়ে এমন চিৎকার দিলেন যে, গোটা গ্রাম হাজির! তা চেঁচাবেন না! দশফুটি এক অজগর যে পাঁঠাকে জড়িয়ে ধরে গিলে ফেলার মতলব আঁটছিল গোয়ালে! বন বিভাগের লোকেরা ছুটে এলেও পাঁঠা ছাড়তে বেজায় আপত্তি জানিয়েছিল অজগরবাবু। শেষে কাবু হয়ে রংধামালির রং খেলা শুরু করিয়ে ফিরে গিয়েছে বনবাবুদের ঝোলায় চেপে জঙ্গলে।

মিষ্টির দোকানে ঢুকে সাবাড় করেছে বেশ কিছু রসগোল্লা। শেষ দোকানটা ছিল পানের। সেখান থেকে পান বানিয়ে খেয়ে, দিস্তেকয়েক পান বগলে নিয়ে কেটে পড়েছে ফাইনালি! অল্পস্বল্প চুরি করে, মিষ্টি খেয়ে, পান চিবুতে চিবুতে কোথায় ভ্যানিশ হয়েছেন চোরবাবু, তা জানা যায়নি। চুরির ধরন দেখে দোকানিরা দুঃখের মধ্যেও মেনে নিয়েছেন যে, ব্যাটা ছিঁচকে হলেও রসিক বটেক!

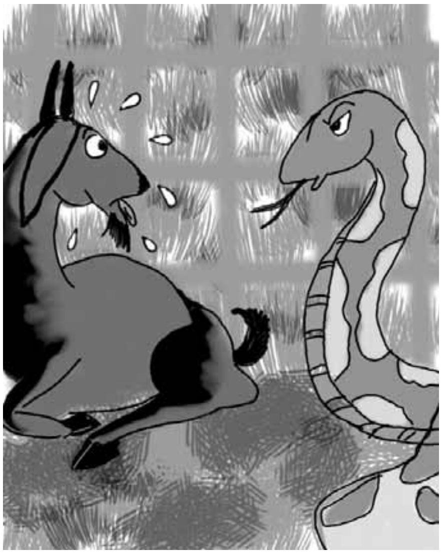

দমফোনকল

ধূপগুড়ি দমকল কেন্দ্রের টোল ফ্রি নাম্বারে ফোন করলে ব্যস্ত থাকার খবর পাওয়া যায়। তাহলে কি ইচ্ছে করে ফোন ‘ব্যস্ত’ রাখেন তাঁরা? না রে খোকা! বিষয়টা এত সিম্পিল নয়কো। সে নাম্বারে দিনরাত পাবলিক ভালবেসে এত ফোন করে যে, কাজের সময় লাইন পাওয়াই দায়। আর সে কী সব ফোন! কেউ বলে, ফোন রিচার্জ করে দিন। কেউ দেয় গালি। কেউ বলে, মারোয়া রাগে খেয়াল শোনান দিকি। কেউ আবার দুর্ঘটনার খবর দিয়ে দমকলকে ছুটিয়ে নিয়ে যান। দেখা যায়, কিস্‌সু ঘটেনি। ভূতুড়ে এবং অভদ্র ফোনের ঠেলা সামলাতেই কেটে যায় দমকলের অধিকাংশ দিন। দু’-চারজন যে পাকড়াও হচ্ছে না, তা-ও নয়। কিন্তু ফোনের বহর কমছেই না। পাবলিক সব শুনে বলছে, এবার থেকে ফালতু ফোন করে ধরা পড়লে কানের কাছে দু’ঘণ্টা দমকলের সাইরেন বাজিয়ে শাস্তি দেওয়া হোক।

টুক্রাণু

ডুয়ার্সে হাতি-চিতা গোনার খচ্চা আধ কোটি। আবর্জনার সুবাসে স্কুল বাতিল ভোটপট্টিতে। ভক্তের চার লাখ টাকা সমেত তাঁর মারুতি নিয়ে ভ্যানিশ হলেন গুরুদেব, কোচবিহারে। নাগরাকাটার কাছে যুবকের ঘাড়ে চেপে বসল চিতা — বরাতজোরে বাঁচোয়া! বিমলের বুকে হাহাকার তুলে শিলিগুড়িতে ঘাসফুল গ্রহণ রাশি রাশি সমর্থকের। শিলিগুড়িতে একদিনে একশোজনকে কামড়ে দিল ভবঘুরে সারমেয়রা। ভূত পাকড়াতে সিসিটিভি ময়নাগুড়ি হাসপাতালে। শালকুমার হাটের বাজারে সবজির তুলনায় আবর্জনা বেশি।

বেড়াতে চলুন আন্দামান

গ্রুপ টুর
যাত্রা শুরু
২১ মে ২০১৭
(পোর্ট ব্লেয়ার থেকে পোর্ট ব্লেয়ার)
আসন সীমিত

৭ রাত ৮ দিনের প্যাকেজ টুর

পোর্ট ব্লেয়ার	-	৪ রাত
হ্যাভলক	-	২ রাত
নীল	-	১ রাত

প্যাকেজ রেট
১৭,৮৫০ টাকা (জন প্রতি)
১৬,৯০০ টাকা (তৃতীয় ব্যক্তি)
১৪,৩০০ টাকা (৫-১১ বছর)
৮,৯০০ টাকা (২-৪ বছর)
(দ্রষ্টব্য: বিমান ভাড়া ব্যতীত প্যাকেজ রেট)

প্যাকেজ খরচের অন্তর্গত
সাইট সিইং, পরিবার প্রতি ঘর, নন-এসি গাড়ি, খাওয়া (ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ ও ডিনার), সরকারি বোট, সকল পারমিট

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

HOLiDAYAAR

Siliguri Office: Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri 734001
Ph: 0353-2527028, +91 9002772928

Cooch-Behar Office:
Ph: +91 9434042969

Jalpaiguri Office: Addaghar, Mukta Bhaban, Merchant Road Jalpaiguri 735101 Ph: 03561-222117, 9434442866

ঘরোয়া প্রকৃতিজ পর্যটনের জনপ্রিয়তা ডুয়ার্সের অর্থনীতিতে নতুন দিশা

উত্তরপক্ষ

প্রশান্ত নাথ চৌধুরী

উত্তরবঙ্গের চারটি জেলা কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং (নবগঠিত কালিম্পংসহ)-এর অর্থনীতি কিছুটা সমৃদ্ধ হতে পারে, যদি পর্যটনকে ব্যাবসায়িক রূপ দেওয়া যায়। তবে এত যে রিসর্ট বা বাংলো গড়ে উঠেছে তা কি ব্যবসা নয়? আমি বলছি, যুগোপযোগী অতিথি আপ্যায়ন, উন্নত রাস্তাঘাট, আধুনিক যানবাহন, আরামপদ রেস্তরাঁ এবং ঝকঝকে একদল গাইড, আরও অনেক কিছু। কিছুদিন আগেও আমাদের সরল সাদাসিধে ছেলেরা সাধারণত টুরিস্টদের সম্বোধন করত কাকু, মাসিমা, দাদা ও বউদি বলে। হাতজোড় করে নমস্কার বা গুড মর্নিং-এর সম্ভাষণ ভাবাই যেত না। রাজেশ পটেল এক গুজরাতি শেয়ার ট্রেডারের সঙ্গে মালবাজারে আলাপ হয়েছিল। তিনি দুটো বিষয় বলেছিলেন—প্রথমত, অমিতাভ বচ্চন গুজরাত পর্যটনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হওয়ার পর গুজরাতে পর্যটকদের আনাগোনা কয়েক গুণ বেড়েছে। দ্বিতীয়ত বলেছিলেন, ‘ঝালং থেকে আসছি, শিলিগুড়ি যাব। পথে সপরিবার বসার একটা নিরামিষ এসি হোটেল পেলাম না।’ বলেছিলেন, ‘মালবাজারে এসে ড্রাইভার পথের ধারে একটা ছোট দোকানে পাউরুটি টোস্ট, দুধের সর ও চিনি, সঙ্গে রসগোল্লা খাইয়েছে। আমাদের লাঞ্চ দারুণ হল।’ তবে আমি হার মানিনি। বলেছি, ‘আমাদের এইসব এলাকায় পথের ধারে ছোট ছোট রেস্তরাঁয় এত সস্তায় এত ভাল খাবার পাওয়া যায়, যা কিনা ভারতের কোথাও পাবেন না।’ আর এখানে এসি-র দরকারই পড়ে না।

কিছুদিন আগে গোরুমারা অভয়ারণ্যে বন্য প্রাণী সাক্ষাৎ করতে যাত্রাপ্রসাদ নজরমিনারে গিয়েছিলাম। একজনের খরচ প্রায় ৩০০ টাকা। তবে ওই অর্থব্যয় সার্থক হবেই। সে যা-ই হোক, বন দপ্তরের টিকিট বুকিং কেন্দ্রটির সামনে সবুজরঙা পেট্রোলচালিত জিপসি জিপগাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়ির পাশে আমি সিগারেট ফুঁকছিলাম। গাইড এসে বলেছিল, ‘কাকু গাড়িতে বসেন, আর জঙ্গলের ভিতর সিগারেট খাবেন না।’ গাড়ি চলতে শুরু করল। গাইড নিশ্চুপ। গোরুমারা বনবাংলোর প্রধান ফটক বন্ধ ছিল। পরপর গাড়ি সার দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর নির্দিষ্ট সময়ে গেটের ভিতর প্রবেশ করলাম। বিচিত্র সব পাখির ডাক। একটি শিশু পর্যটক ঘুঘু দেখে জিজ্ঞেস করল, ‘ওটা কি পায়রা?’ গাইড সঠিক উত্তর দিয়েছিল। হঠাৎ একবার বলল, ‘জঙ্গলে জোরে কথা বলবেন না, আর প্লাস্টিক ফেলবেন না।’ ওই চার-পাঁচটি বাক্য ছাড়া

পথের সাথী, লাটাগুড়ি

গাইড কিছুই বলেনি। অথচ কতরকম পাখি, কত অচেনা গাছ, বন্য প্রাণী— সবাই তা জানতে চায়, কিন্তু গাইড একদম চুপচাপ।’ যাত্রাপ্রসাদ নজর মিনারে বসে সে দিন বেশ কিছু গন্ডার, হরিণ, পেখম-মেলা ময়ূর দেখেছিলাম। সন্ধ্যায় ফেরার পথে মোষের চেহারায় পায়ে যেন সাদা মোজা পরা গাউর এবং জঙ্গলের পাশে একপাল হাতি মটমট করে গাছের ডাল ভাঙছিল। গোরুমারা অরণ্যে যে কতরকম বনৌষধি, অর্কিড ও প্রজাপতি আছে তা বর্ণনা করা যায় না। গাইড ছেলেটি যদি একটি সপ্রতিভ হত তাহলে বনের অনেক অজানা তথ্যের হদিশ পাওয়া যেত। এখন গাইডরা কিন্তু পর্যটকদের প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটাতে সাহায্য করে এবং সম্ভাষণ বা ভদ্রতা বিনিময় অনেক কেতাদুরস্ত।

গোরুমারা ন্যাশনাল পার্ক

উত্তরবঙ্গে পর্যটনের পরিকাঠামো অপরিকল্পিতভাবে তৈরি হয়েছে, এবং সেটাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগে। শুধুমাত্র ব্যাবসায়িক কারণে অরণ্যের কোল ঘেঁষে তৈরি ওইসব পরিকাঠামো প্রাকৃতিক ভারসাম্যের বিনাশ করতে পারে। গোরুমারা সংলগ্ন অঞ্চলে প্রায় ৬৬টি রিসর্ট তৈরি হয়েছে— তা ছাড়া এলাকার অনেক বাসিন্দা বসতবাটির কিছু অংশে ভ্রমণকারীদের থাকার ব্যবস্থা করেন। সুতরাং রিসর্টের সঠিক সংখ্যা বলা সম্ভব নয়।

আশার কথা, রিসর্ট মালিকদের সংগঠন ইদানীং যত্রতত্র পরিকল্পনাহীনভাবে রিসর্ট তৈরির ক্ষেত্রে উদ্‌বেগ প্রকাশ করেছে। রাজ্য সরকারের পর্যটন দপ্তর এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর উন্নত পরিকাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

গত ৩০ মে ডিসেম্বর ২০১৬-তে ভ্রমণকারীদের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি নজর দিয়ে রাজ্যের আবাসন দপ্তর লাটাগুড়ি এবং চালসায় দু’টি স্বয়ংসম্পূর্ণ আধুনিক বাংলো তৈরি করেছে। চালসার বাংলোটি স্বনির্ভর মহিলাদলের মাধ্যমে চলছে, এবং লাটাগুড়িরটিও তাড়াতাড়ি চালু হবে আশা করা যায়। আশার কথা, সরকার বাংলো দু’টি পরিচালনার জন্য স্বনির্ভর মহিলাদলের উপর আস্থা রেখেছে। জলপাইগুড়ি জেলা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থার প্রকল্প আধিকারিক কথা

পথের সাথী চালসার বেড রুম

এখন ডুয়ার্স প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি
৯৪৩৪৩২৭৩৪২
শিবমন্দির
অনুপ দাস ৯৮৩২০২৯৫১৪
জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক ৯৭৩৩২৪৬৯১৩
হলদিবাড়ি
অমল দাস ৯৪৩৪৮০৬৩৮৩
মালবাজার
বিশ্বনাথ বাগচি ৯৮৩২৬-৮৩৯৮৮
চালসা
দিলীপ সরকার ৯৭৭৫৪১৫১৪৪
বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল
৯৪৩৪৮০৯৫৯০
বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২
লাটাগুড়ি
বিশ্বজিৎ রায় ৯৯৩২৫৩৪৮৮৫
ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮
ধূপগুড়ি
অমিত কুমার দে ৯৬৪৭৭৮০৭৯২
ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল ৯৭৪৯৩৭৬৪৯৫
আলিপুরদুয়ার
দীপক হোড় ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭
কোচবিহার
জয়ন্ত দাস ৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাছাড়ি মোড়
তুফানগঞ্জ
দীপেন্দ্র সাহা ৮৯৭২০২০৬০০
মাথাভাঙা
বরুন সাহা ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮
দিনহাটা
আবেদ আলি ৯৮৩২৩৪৭৪৫১
মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি
৯৯৩২৯৬৭৯৯১
রায়গঞ্জ
সুরঞ্জন সরকার ৯৪৩৪৪২৩৫২২
বালুরঘাট
মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন
৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক
০৩৩-২২৫২৭৮১৬

পথের সাথী চালসা

প্রসঙ্গে বলছিলেন, 'এমন একটি জীবিকার সঙ্গে মহিলাদের পরিচিতি কম, কাজেই প্রথম দিকে একটু অসুবিধা হলেও তাঁরা এই প্রকল্প আগামী দিনে ভালই চালাবেন।' সরকার এই রিসর্ট বা বাংলোর নাম দিয়েছে 'পথের সাথী'।

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে গাড়িতে প্রায় ৬২ কিলোমিটার দূরে চালসা মোড়। ওখান থেকে মেটেলির পথে ২/৩ কিলোমিটার পাহাড়ি চড়াই এগলেই চালসার 'পথের সাথী'। এনজেপি থেকে শিলিগুড়ির বুক চিরে সেবক, মালবাজার হয়ে চালসার যে যাত্রাপথ, তার প্রাকৃতিক শোভা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। পাহাড় কেটে রাস্তা, ঝরনা, নদী, বন ও বন্য প্রাণী এবং ঘন সবুজ চা-বাগিচা স্মৃতিতে বহুদিন থেকে যাবে। পথে সেবক কালীবাড়ি এবং অর্ধগোলাকৃতি আর্চের উপর তিস্তা নদীর ব্রিজ, যা বাঘ পুল নামে খ্যাত, চোখে পড়বেই।

এখন অনেকেই অবগত আছেন, মহিলাদের সচেতনতা ও জীবিকার ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী করে তুলতে গ্রামের দশ থেকে কুড়িজন গরিব মহিলা মিলে তৈরি করেছেন স্বনির্ভর দল বা সেল্‌ফ হেল্প গ্রুপ। মেটেলি ব্লকের মাটিয়ালি বাতাবাড়ি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বনির্ভর দলগুলো মিলিতভাবে তৈরি করেছে একটি সংগঠন, নাম 'রচনা সংঘ'। ওই সংঘ থেকে দশজন চালসা 'পথের সাথী'র দায়িত্ব নিয়েছেন।

স্থানটিকে কেন্দ্র করে ভ্রমণার্থীরা সামসিং, সুনতালেখোলা, রকি আইল্যান্ড, জুরন্তি, বিন্দু-ঝালং, ধূপঝোরা-মূর্তি, চাপড়ামারি বা গোরুমারা অভয়ারণ্য ঘুরে দেখতে পারেন। জায়গাটি আপনাকে আকর্ষিত করবেই। পাহাড়, ঘন সবুজ, গাছপালা— একটু চড়াই ভাঙলেই একটা মিষ্টি পার্ক। ওখান থেকে চালসার জনপদ, দূরে গোরুমারা বনাঞ্চল, নদী। ডাইনে নেওড়া ভ্যালির আবছায়া দৃশ্য আর একটু উপরে মিলেমিশে সবুজ চা-বাগিচা। আপনার ভাল লাগবেই, গ্যারান্টি থাকল।

আপনি অবাক হয়ে দেখবেন, আদিবাসী রমণীদের সঙ্গে রাজবংশী ও নেপালি মহিলারা একসঙ্গে কোনও অভিজ্ঞতা বা প্রশিক্ষণ ছাড়াই রিসর্টটি চালাচ্ছেন। 'অতিথি দেবো ভব' দর্শন মনে রেখে ওঁরা হাতজোড় করে অতিথিদের স্বাগত জানান। ঝকঝকে ঘর-বাথরুম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বিছানা। দ্বিশয্যার ঘর ভাড়া ৭০০ টাকা। অল্প ভাড়ায় একটা চার বেডের রুম আছে। দোতলায় দু'টি ডাবল বেড ও একটি চার বেডের রুম। অর্থাৎ রিসর্টটিতে মোট আটজনের থাকার ব্যবস্থা। নিচে মিনি অফিস, বেশ বড়সড় আধুনিক ডাইনিং রুম, রান্নাঘর, দু'টি প্রশস্ত টয়লেট। সামনে বেশ খানিকটা জায়গা। এখনও গাছপালা লাগানো হয়নি। তবে রঙিন ছাতার নিচে বসে চা সহযোগে আড্ডা ভালই জমে। এদের বানানো খাবার স্বাদে-গন্ধে মনে রাখার মতো। ওদের তৈরি তরকা-রুটি, মোমো, চাউমিন অবশ্যই চেখে দেখবেন। বিকেলে রিসর্টের সামনে ফাস্ট ফুডের দোকান লাগায়। তবে উপরতলায় জল সরবরাহের কিছু অসুবিধা ছিল— সামান্য কাজ এতদিনে ঠিক হওয়ার কথা। বাড়িটি নতুন, তবুও বাইরের রং মলিন। আবাসন দপ্তর এইসব টুকটাক কাজ তাড়াতাড়ি করলে সুবিধা হবে। রিসর্টটির সামনে একটা ফ্লেক্স, ওটাই সাইনবোর্ড। রাস্তার ধারে সাইনবোর্ড এবং দেওয়ালের গায়ে একটা গ্লো সাইনবোর্ড লাগানো দরকার। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দপ্তরের ওয়েবসাইটে 'পথের সাথী'গুলির পরিচয় ঘটানো দরকার। লাটাগুড়ির 'পথের সাথী' এখনও চালু হয়নি। কিন্তু ওদের সাইনবোর্ডটি কিন্তু দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আমাদের অতি সাধারণ ঘরের মেয়েরা যে দক্ষতায় 'পথের সাথী'টি চালাচ্ছেন, তাতে হোম টুরিজম এবং হোমস্টেকে তাঁরা অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন। কেবল একটু প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। 'পথের সাথী' আদতে রিসর্ট নয়, একটা আধুনিক হোমস্টে।

ইতিমধ্যে কোনও পাঠক যদি মনস্থির করে থাকেন, চালসা 'পথের সাথী'তে আসবেন, তবে আপনি ফোনে (৭০২৯২ ৯২১৬৬) মীনা দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। বুকিং করলে অবশ্যই আসবেন। আপনি না এলে ওদের আর্থিক ক্ষতি হবে। সঙ্গে পরিচয়পত্র থাকা চাই।

ছোট্ট অফিসের আলমারিতে পাটের হস্তশিল্পের টুকিটাকি আছে। স্মৃতি রাখতে সংগ্রহ করতে পারেন।

রিসর্ট থেকে বিদায়কালে ওই মেয়েরা হাতজোড় করে আপনাকে আবার আসার আমন্ত্রণ জানাবে। আপনার মন ভারী হয়ে উঠবে।

চা বাগানের হতদরিদ্র শ্রমিক মংরা ওরাও অসুস্থ এবং ছাঁটাই হয়েছে। পাশে নেই বাম-ডান কেউই

স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন এবং নিজেদের কারখানার লক্ষ্যে সংঘবদ্ধ হোক ক্ষুদ্র চা-চাষিরা

‘এখন ডুয়ার্স’-এর পক্ষ থেকে চায়ের ডুয়ার্সের কোণে কোণে ঘুরে তুলে আনা জ্বলজ্যান্ত ছবি পেশ করছেন **ভীষ্মলোচন শর্মা** তাঁর ধারাবাহিক প্রতিবেদনের **ত্রয়োদশ পর্বে**।

চায়ের ডুয়ার্স ডুয়ার্সের চা

দেখতে দেখতে বারোটি পর্ব অতিক্রম করে ফেললাম। উত্তরবঙ্গের জনপ্রিয় পাক্ষিক ‘এখন ডুয়ার্স’-এর পক্ষ থেকে সম্পাদকীয় দপ্তর এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য যখন আমাকে মনোনীত করেছিল, তখন একটু আঁতকে উঠেছিলাম বইকি। কারণ এত বিরাট একটা ক্ষেত্র, পর্বতপ্রমাণ সমস্যা, শ্রমিক-মালিক, সরকার সমন্বয়ের অভাব বড়ই প্রকট— একে মানুষের সামনে হাজির করাটা দুঃসাধ্যের কাজ। পাশাপাশি নেশায় লেখালেখি করি বলে মূল পেশা শিক্ষকতার কাজটাকেও তো প্রথম পছন্দের তালিকায় রাখতে হবে। তাই প্রাথমিক ভয়ভীতি কাটিয়ে নেমে পড়লাম ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজে। এবং সবচেয়ে বড় কথা, আমি তো গৌতম চক্রবর্তী নই, আমি ভীষ্মলোচন শর্মা। কবি সুকুমার রায়ের ভীষ্মলোচন শর্মার গানের আওয়াজ যেমন সুদূর দিল্লি থেকে বর্মা পর্যন্ত সঞ্চারিত হত, তেমনি ‘এখন ডুয়ার্স’-এ প্রকাশিত চা-বাগিচার জীবন ও জীবিকার নিরপেক্ষ অপ্রকাশিত ইতিহাস যাতে দেশ, দেশ ছাড়িয়ে বিশ্বেও পৌঁছাতে পারে, সেই জন্যই পছন্দের ছদ্মনাম ভীষ্মলোচন শর্মা নিয়ে চা-বাগিচার প্রান্তরে প্রান্তরে ঘুরে শ্রমিক, মালিক, শ্রমিক নেতা, টি বোর্ড, ডিবিআইটিএ, আইটিপিএ, ডিটিএ, ট্রাই, ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ— সকলের সহযোগিতায় বারোটি পর্বে তুলে আনলাম চা-বাগিচার আর্থ-সামাজিক ইতিহাস। শ্রমিকদের অসহনীয় কষ্ট, সরকারের উদাসীনতা, আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে বাগান খোলার জন্য রাজ্য সরকারের ঐকান্তিক চেষ্টা, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের অধিগ্রহণজনিত দ্বন্দ্ব— সব মিলিয়ে এক অসহনীয় অভিজ্ঞতা হয়েছে, উঠে এসেছে তারই আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক প্রতিচ্ছবি। কিন্তু বারোটা পর্বে ক্ষেত্রসমীক্ষার নির্যাস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে দেখলাম, প্রত্যেকটি বাগানের মূল সমস্যার নির্যাসটুকু ঘুরে-ফিরে এক। এরই মাঝে আবিষ্কার করলাম অন্ধকারের মধ্যে রুপোলি এক আলোর ঝলক— টি টুরিজম— মকাইবাড়ি, রাগিচেরা, গ্লেনবার্ন, সংকোশ, নিউল্যান্ডস, হ্যাপি ভ্যালি ইতিমধ্যেই যেটা

শুরু করেছে। আর বড়ই অদ্ভুতভাবে লক্ষ করলাম, বৃহৎ চা-বাগান বা চা ফ্যাক্টরিগুলির পাশাপাশি কচ্ছপের মতো হাঁটা শুরু করেছিল যে ক্ষুদ্র চা-বাগিচাক্ষেত্র, তারাও ভারতে ৩৫ শতাংশ বাজার দখল করে ফেলেছে ইতিমধ্যেই, এবং জলপাইগুড়ি জেলায় এই ক্ষুদ্র চা-শিল্প একটা বৃহৎ বাজার দখল করে ফেলেছে।

তথ্যটা পেলাম বিশিষ্ট চা গবেষক রাম অবতার শর্মার সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎকারে। সুদূর বরোদা থেকে সম্প্রতি কোচবিহারে এসেছিলেন বরোদার রাজপরিবারের বর্তমান প্রজন্মের অন্যতম সদস্য জিতেন্দ্র সিং গায়কোয়াড়। কোচবিহার এবং বরোদার দু'টি রাজপরিবার বৈবাহিক সূত্রে একে অপরের আত্মীয়। কোচবিহার রাজপরিবারের কন্যা গায়ত্রী দেবীর শুভবিবাহ হয়েছিল বরোদার রাজপরিবারের সঙ্গে। সেই সূত্রেই দীর্ঘ কয়েক দশক পর জিতেন্দ্র সিং গায়কোয়াড় কোচবিহারে এসে কোচবিহারের মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ প্রতিষ্ঠিত চা-বাগানটি পরিদর্শন করতে গিয়ে কার্যত নস্টালজিক হয়ে পড়েন। চা-বাগানটি উদ্‌বোধনের সময় ছিলেন তৎকালীন জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস নেতা অতুল্য ঘোষ, প্রাক্তন মন্ত্রী বিজয় সিং নাহার প্রমুখ। ডুয়ার্সের বাগানগুলিকে আন্তর্জাতিক হেরিটেজ পর্যটন মানচিত্রে জুড়তে চান জিতেন্দ্র সিং। আন্তর্জাতিক পর্যটন সম্প্রসারণের কাজে যুক্ত জিতেন্দ্র সিং চা-বাগিচার অপার সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে সৌন্দর্যের খনি ডুয়ার্সের চা-বাগানকে যাতে আন্তর্জাতিক হেরিটেজ পর্যটন মানচিত্রের সঙ্গে যুক্ত করা যায়, তার জন্য প্রয়াসী হবেন বলে জানিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই চা-বাগান পর্যটনকে বিশ্বের ঐতিহ্যশালী পর্যটনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের এই ঘোষণায় রাম অবতার শর্মা-সহ খুশি ডুয়ার্সের আপামর মানুষ।

ভারতীয় অর্থনীতিতে দীর্ঘদিন ধরেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে চা-শিল্প। প্রতিযোগিতামূলক চায়ের বাজারে স্বাভাবিক কারণেই গুণগতমানের চায়ের কদর যথেষ্ট। ভারতের চা-শিল্পের আরও অগ্রগতির পাশাপাশি ক্ষুদ্র চা-বাগানের প্রসার ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, তামিলনাড়ু, কেরালা, ত্রিপুরা, অরুণাচলপ্রদেশ, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, হিমাচলপ্রদেশ এবং মিজোরামে। ক্ষুদ্র চা চাষির সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ২০ লক্ষের উপর। ক্ষুদ্র চা-বাগানের উৎপাদন ক্রমবর্ধমান। ভারতের উৎপাদিত চায়ের শতকরা ৩৬ ভাগই আসে ছোট চা-বাগানগুলি থেকে। উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতির হৃৎপিণ্ড হল ক্ষুদ্র চা-শিল্প। ক্ষুদ্র চা চাষিদের যে সংগঠন, তার সর্বভারতীয় সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তীর মতে, উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা করার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র চা-বাগানগুলি অনবদ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

প্রকৃতপক্ষে দেশ স্বাধীন হবার পর শিল্প বিকাশের ধারা অব্যাহত। উত্তরবঙ্গে চা ছাড়া ভারী শিল্প গড়ে ওঠেনি। উত্তরবঙ্গে মূলত দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে চা উৎপাদন হয়। সময়ের ব্যবধানে উত্তরবঙ্গে চা চাষের প্রসার ঘটেছে। জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জেলার বড় চা-বাগানগুলির পাশাপাশি উত্তর দিনাজপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জেলাতেও ক্ষুদ্র চা-বাগান রয়েছে। ক্ষুদ্র চা-বাগানের চা আবাদি এলাকা বেড়েছে। আবাদি এলাকা বৃদ্ধির পাশাপাশি ক্ষুদ্র চা-বাগানের উৎপাদন বেড়েছে। ভারতে চা উৎপাদনের রেকর্ড পর্যালোচনা করে দেখা গিয়েছে, উৎপাদিত চায়ের ৩৫ শতাংশ ক্ষুদ্র চা। ২০১৩ সালে ভারতে চা উৎপাদন হয়েছিল ১১৮০ মিলিয়ন কেজি। ক্ষুদ্র চা-বাগানে উৎপাদিত চায়ের পরিমাণ ছিল ৪২৫ মিলিয়ন কেজি। চা বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, ২০২০ সালে ভারতে উৎপাদিত চায়ের ৫০ শতাংশই আসবে ক্ষুদ্র চা-বাগানগুলি থেকে। জলপাইগুড়িতে ক্ষুদ্র চা-বাগানের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়েছে। জেলার জলপাইগুড়ি সদর, রায়গঞ্জ, ময়নাগুড়ি, মাল, ধূপগুড়ি, মেটেলি, মাদারিহাট, নাগরাকাটা, আলিপুরদুয়ার-১ এবং আলিপুরদুয়ার-২ নম্বর ব্লকেও ক্ষুদ্র চা-বাগান হয়েছে। ২০১৩ সালে অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলাতে ৭,০২৪টি ছোট চা-বাগান ছিল, আবাদি এলাকার পরিমাণ ছিল ১৯,৫০৬ একরের মতো। দার্জিলিং জেলার সমতলে ক্ষুদ্র চা-বাগান হয়েছে মাটিগাড়া, ফাঁসিদেওয়া, নকশালবাড়ি এবং খড়িবাড়ি এলাকাতেও। সমতলের পাশাপাশি পাহাড়ের কার্শিয়াং, কালিম্পং, মিরিক, সুখিয়াপোখরি এলাকাতেও চোট চা-বাগান আছে প্রায় হাজারেরও বেশি, এবং ১,৩০০ হেক্টর জমিতে কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ, মাথাভাঙা-১ এবং মাথাভাঙা-২ নম্বর ব্লকে ছোট চা-বাগান আছে প্রায় হাজারের মতো। বিজয়গোপালবাবু ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির

এইভাবেই পিঠে বস্তা বেঁধে বাচ্চা নিয়ে কাজ করে নারী শ্রমিকেরা। নেই কোনও ক্রেশের ব্যবস্থা

সর্বভারতীয় সভাপতি। বিজয়গোপালবাবুর মতে, ২০০১ সাল থেকে যখন চা চাষ শুরু হয় ক্ষুদ্রাকারে, তখন থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে উত্তরবঙ্গে ক্ষুদ্র চা-বাগানের সংখ্যা ছিল ২৩, ৩৯০। ক্ষুদ্র চা চাষিরা ২০০১ সালে যেখানে ৫৮,১৮৪ একর জমিতে চাষাবাদ করতেন, ২০০৯ সালে সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৯১, ৯৫৭.৩৩ একর। ২০১৬ সালে এই পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ ছুঁয়ে ফেলেছে বলে বিজয়গোপালবাবুর দাবি। বেসরকারি মতে, উত্তরবঙ্গে বর্তমানে প্রায় ৪০ হাজার ক্ষুদ্র চা চাষি আছেন। ক্ষুদ্র চা চাষিরা বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার হেক্টর জমিতে চাষাবাদ করেন। ২০০১ সালে যেখানে উত্তরবঙ্গের ছোট বাগানগুলি থেকে চা উৎপাদন হত ১৫ মিলিয়ন কেজি, ২০১৩ সালে ছোট চা-বাগানগুলির উৎপাদিত চায়ের পরিমাণ ১২৫ মিলিয়ন কেজি। চায়ের শহর জলপাইগুড়িতে সর্বভারতীয় ক্ষুদ্র চা চাষিদের সম্মেলনে মোজাম্বিক, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি দেশ থেকে আসা ক্ষুদ্র চা চাষি সংগঠনের প্রতিনিধিরা ভারতে ক্ষুদ্র চায়ের প্রসার দেখে তাই ভীষণ খুশি। এই কারণে ভারতীয় চা-পর্ষদের পক্ষ থেকেও দেশব্যাপী ক্ষুদ্র চা-বাগান ও চাষিদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করার কথা বলা হয়েছে।

তবে সমস্যায় রয়েছেন উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চা চাষিরা। কাঁচা পাতা বিক্রির সময় টি বোর্ডের বেঁধে দেওয়া ন্যূনতম সময় নিয়ে অভিযোগ তুলেছেন উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চা চাষিরা। সারা বছরের মধ্যে মাত্র তিন থেকে চার মাস ওই ন্যূনতম দাম বা তার থেকে বেশ কিছু বেশি দাম মিললেও, বাদবাকি সময়টুকু অনেক কম দামেই কাঁচা পাতা বিক্রি করতে হয়। বিজ্ঞপ্তি জারি করে টি বোর্ড প্রতি মাসেই ক্ষুদ্র চা চাষিদের কাঁচা পাতার এমবিপি বেঁধে দেয়। মূল্য বন্টন সূত্র বা প্রাইম শেয়ারিং ফর্মুলার মাধ্যমে এমবিপি নির্ধারিত হয়। উত্তর ভারত বা উত্তরবঙ্গে তৈরি সমস্ত চা নিলামের মাধ্যমে বিক্রি হয় না। যাদেরকে ক্ষুদ্র চা চাষিরা কাঁচা পাতা বিক্রি করে, সেই বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলিও সমস্ত চা নিলামে বিক্রি করে না। ফলে যে চা অন্যভাবে বা প্রাইভেটে বিক্রি হয়, তার বিক্রয়মূল্য সঠিক কী ছিল তা জানা সম্ভব হয় না। ফলে মূল্য বন্টন সূত্র প্রয়োগ করে টি বোর্ড মাসিক ভিত্তিতে কাঁচা পাতার যে এমবিপি নির্ধারণ করে তা কখনওই সঠিক হয় না। ফলে একেই তো এমবিপি নির্ধারণের মধ্যেই নানা কারণে অস্বচ্ছতা রয়ে যাচ্ছে, আবার তার উপর যেটুকু দাম এমবিপি-র মাধ্যমে মেলার কথা, বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলি বেশির ভাগ সময়েই তার থেকে কম দামে পাতা কিনছে। তাই ক্ষুদ্র চা চাষিদের বিপদ বাড়ছে। ক্ষুদ্র চা চাষিদের অভিযোগ, টি বোর্ড এমবিপি নিয়ে শুধু বিজ্ঞপ্তি জারি করেই নীরব দর্শক, প্রকৃত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছে না।

বাগানে এইভাবেই টি টুরিজমের মাধ্যমে পর্যটকদের চা বাগানের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড দেখানো যায়

মেখলিগঞ্জ এবং ময়নাগুড়ি ব্লকে বহু ক্ষুদ্র চা চাষি রয়েছেন। তাঁদের অনেকেরই অভিযোগ, কাঁচা চা-পাতার ন্যায্য দাম তাঁরা পাচ্ছেন না। ফ্যাক্টরিতে চা-পাতা বিক্রি করার সময়ে ফড়ে বা দালালদের খপ্পরে পড়তে হচ্ছে। ফ্যাক্টরিতে কী দাম থাকছে, সেটা চাষিদের পক্ষে জানা সম্ভব হচ্ছে না। আর্থিক দুর্বলতার কারণে অনেক গরিব চাষি বাধ্য হয়ে ফড়েদের কাছে কাঁচা চা-পাতা বিক্রি করছেন। বাজারের দাম তাঁরা জানতে পারছেন না বলে ফড়েরা যে দাম দিচ্ছেন, চাষিরা সেই দামই নিচ্ছেন। কথা হচ্ছিল ভোটবাড়ির ক্ষুদ্র চা চাষি অনিমেষ রায়ের সঙ্গে। তাঁরও একই বক্তব্য। হেলাপাকড়ির শ্যামল রায় বসুনিয়ার মতে, বছরের পর বছর ধরে কাঁচা পাতার সঠিক দাম থেকে বঞ্চিত তাঁরা। ফড়েদের খপ্পর থেকে বার হয়ে এসে তাঁরা নিজেরাই নিজেদের লভ্যাংশ বুঝে নিতে চেষ্টা চালাচ্ছেন। জলপাইগুড়ি জেলা স্মল টি গ্রোয়ারস অ্যাসোসিয়েশন-এর সভাপতি রজতকুমার রায় কাজিও বিষয়টির সঙ্গে নীতিগতভাবে একমত।

পাশাপাশি অন্ধকারের মধ্যে আলোকশিখা প্রজ্বলিত হলে কার না ভাল লাগে? ভারতীয় চা-পর্ষদ এবং ক্ষুদ্র চা-বাগান মালিকদের যৌথ উদ্যোগে ক্ষুদ্র চা-বাগানের শ্রমিকদের জন্য দুর্ঘটনা বিমা চালু হয়েছে। বছরে মাত্র ১৪ টাকা প্রিমিয়াম দিলে শ্রমিকরা ২ লক্ষ টাকার দুর্ঘটনাজনিত বিমার আওতায় আসবেন। ১৪ টাকার প্রিমিয়ামের মধ্যে সাড়ে দশ টাকা দেবে টি বোর্ড এবং বাকি সাড়ে তিন টাকা দেবেন ক্ষুদ্র চা-বাগানের মালিকপক্ষ। ফলে বাগানের শ্রমিকরা বিনা পয়সায় ২ লক্ষ টাকার বিমার সুযোগ পাবেন। ১৭ থেকে ৭০ বয়সের শ্রমিকরা এই বিমা করতে পারবেই।

ক্ষুদ্র চা-বাগানগুলি সাধারণত ২৫ একরের মধ্যেই হয়ে থাকে। তাই চা চাষের পাশাপাশি পেঁপে, কলা ইত্যাদি বাগিচা ফসল চাষেও আগ্রহী হচ্ছেন উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চা চাষিরা। উত্তরবঙ্গে প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার ক্ষুদ্র চা চাষি বড়, ক্ষুদ্র, মাঝারি বটলিফ চা-বাগানে যা চা উৎপাদন করেন, তাতে ক্ষুদ্র চা-বাগানগুলিতে প্রতি কেজি উৎপাদনে খরচ হয় ১১ টাকার মতো। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেজিপ্রতি কাঁচা চা-পাতার দাম ১৪ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে বলে লাভজনক চা চাষ মার খাচ্ছে। তাই চা চাষের বিকল্প অর্থনৈতিক ফসল উৎপাদন করতে পারলে আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বী হবেন ক্ষুদ্র চা চাষিরা। তাঁরা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনোলজি বিভাগের অধীন সেন্টার ফর ফ্লোরিকালচার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট-এর পরামর্শ নিলে লাভবান হতে পারেন।

জলপাইগুড়ি জেলায় প্রতিদিন মোট কাঁচা পাতা উৎপাদনের মধ্যে ২০ লক্ষ কেজির বেশি আসে ক্ষুদ্র চা-বাগানগুলি থেকেই। বাইরের জেলা থেকে আরও ৩/৪ লক্ষ কেজি কাঁচা পাতা বটলিফ ফ্যাক্টরিতে নিয়ে আসা হয়। জেলাতে বটলিফ ফ্যাক্টরি মাত্র ৬৪টি বলে অধিক মাত্রায় কাঁচা চা-পাতা চলে আসার ফলে বটলিফ ফ্যাক্টরি কর্তৃপক্ষ চা-পর্ষদ নির্ধারিত দাম দিচ্ছেন না। তাই জেলাতে প্রয়োজনভিত্তিক আরও বটলিফ ফ্যাক্টরি তৈরি করার দাবি জানানো হয়েছে

চা-পর্ষদের ডেপুটি ডিরেক্টর রমেশ কুজুরের কাছে। সেই সঙ্গে বটলিফ ফ্যাক্টরিকে কেন্দ্র করে কাঁচা চা-পাতা বিক্রির জন্য নির্দিষ্ট এলাকা নির্ধারণ করে দেবার দাবিও জানানো হয়েছে। চা-পর্ষদের ডেপুটি ডিরেক্টর রমেশ কুজুর প্রয়োজনভিত্তিক বটলিফ ফ্যাক্টরির অনুমোদন দেবার ব্যাপারে নীতিগতভাবে রাজি হয়েছেন।

স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে জোটবদ্ধ হয়ে মেখলিগঞ্জ এবং ময়নাগুড়ি ব্লকের ক্ষুদ্র চা চাষিরা যে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়েছিলেন তা আজ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার ক্ষুদ্র চা চাষিদের নতুন করে দিশা দেখাচ্ছে। এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর উদ্যোগেই ভোটপট্টি বালাসন এলাকায় জয় জল্পেশ নামে একটা চা ফ্যাক্টরি গড়ে উঠেছে। এই গোষ্ঠীর হাত ধরেই তাঁদের তৈরি চা পাড়ি দিচ্ছে বিদেশের বাজারে। ইতিমধ্যেই রাশিয়া, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, কাজাখস্তান ইত্যাদি দেশের ব্যবসায়ীদের কাছে এই স্বনির্ভর গোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত কারখানার চা-পাতার নমুনা পৌঁছে গিয়েছে। সেই নমুনা দেখে সন্তোষও প্রকাশ করেছেন বিদেশের চা ব্যবসায়ীরা। তাই ক্ষুদ্র চা নিয়ে এখন নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি, এবং জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী, কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ারস অ্যাসোসিয়েশন-এর কোষাধ্যক্ষ রজত রায়কার্জি প্রমুখ। তাঁদের মতে, স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ে কারখানা তৈরি করতে পারলে ক্ষুদ্র চা চাষিরা অনেক বেশি লাভবান হবেন।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে আছে প্রচুর ছোট ছোট চা-বাগান। এইসব ছোট চা-বাগানে চাষিরা চা উৎপাদন করে অনেক সময় তাঁরা সঠিক দাম পান না। আবার সব চাষির পক্ষে দূরবর্তী কারখানায় গিয়ে উৎপাদিত চা-পাতা বিক্রি করা সম্ভব হয় না। তাই চাষি এবং কারখানার মাঝে এক শ্রেণির ব্যবসায়ী চাষিদের কাছ থেকে কাঁচা পাতা ক্রয় করে কারখানায় দিয়ে থাকেন অনেক ক্ষেত্রেই। এতে স্বাভাবিকভাবেই চাষিদের লভ্যাংশ কমে যায়। তাই তাঁরা নিজেদের জমির কাঁচা পাতা নিজেদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর উদ্যোগে তৈরি কারখানায় বিক্রি করতে পারলে অনেক বেশি লাভবান হবেন। এই লক্ষ্যেই পরিকল্পনা গ্রহণ করছে জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতি, এবং এই লক্ষ্যে জেলা, রাজ্য, দেশ এবং বিদেশে ছুটে চলেছেন একটি মানুষ, সংগঠক, চা চাষি কাম প্ল্যান্টার বিজয়গোপাল চক্রবর্তী, যিনি হয়ত আগামীতে আরও দিশা দেখাতে পারবেন অ্যাটলাস নির্দেশিত টি টাউনের হৃত গরিমাকে ফিরিয়ে আনতে।

‘ক্ষুদ্র চা-চাষের কল্যাণেই দেশে চা এখন জলের চেয়েও সস্তা’

ডুয়ার্সে ক্ষুদ্র চা-চাষে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। বড় বড় প্রাতিষ্ঠানিক বাগান বা ফ্যাক্টরির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাজার দখল করার লক্ষ্যে এগচ্ছেন ক্ষুদ্র চা-চাষিরা তাঁদের উৎপাদিত চা নিয়ে। ক্ষুদ্র চা-চাষিদের সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তীর একান্ত সাক্ষাৎকার নিলেন প্রতিবেদক। যা থেকে উঠে আসে ক্ষুদ্র চা নিয়ে বেশ কিছু অজানা তথ্য।

এখন ডুয়ার্স: সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, ক্ষুদ্র চা-চাষিদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। ভারতীয় বাণিজ্যমন্ত্রক ক্ষুদ্র চায়ের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তাকে কী চোখে দেখছে?

বিজয়গোপাল: আসলে বর্তমানে উৎপাদন খরচের লক্ষ্যমাত্রার দিকে তাকিয়ে উৎপাদন খরচ কমানোটা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। তাই বড় বড় চা-বাগান বা ফ্যাক্টরির পাশাপাশি ক্ষুদ্র চা-চাষের দিকেও কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রক নজর দিয়েছে। সরকারকে ভাবতে হচ্ছে যে, ৩৫ শতাংশ চা যদি ক্ষুদ্র চা-চাষিদের কাছ থেকে না আসত তাহলে সরকারকে বিদেশি মুদ্রা খরচ করে এই চা বিশ্বের বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হত। এতে জিডিপি-তে একটা বড় এফেক্ট হত। ক্ষুদ্র চা-চাষিরা তাই ভারতীয় অর্থনীতিতে আশীর্বাদস্বরূপ। ভারতের মানুষ আজ কম দামে চা খাচ্ছে। চা এখন জলের চেয়েও সস্তা। ভারতে অতিথিপরায়ণতার কথা বলেন তো চা এক অত্যন্ত জনপ্রিয় পানীয়। আমরা সকালেও যাত্রা শুরু করি খাদ্যতালিকায় চা দিয়ে। এখন দেখা যাচ্ছে, অনেকে গ্রিন টি ছাড়া রাতে শুতে যাচ্ছে না।

এখন ডুয়ার্স: তাহলে কি চা লাইফস্টাইলের ক্ষেত্রেও একটা পরিবর্তন আনছে?

বিজয়গোপাল: অবশ্যই। চা লাইফস্টাইলেও একটা পরিবর্তন সূচিত করেছে। এই যে আড়াই লক্ষের উপরে ক্ষুদ্র চা-চাষি রয়েছে আসামে, তামিলনাড়ুতে, পশ্চিমবঙ্গে, মিজোরাম, নাগাল্যান্ডে, তাদের ক্ষেত্রেও ভাবছে ভারতীয় বাণিজ্যমন্ত্রক। ভারতের চায়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে উৎপাদন খরচ। সেখানে কেনিয়া, শ্রীলঙ্কার উৎপাদন খরচ অনেকটাই কম। যারা ৬০ শতাংশ চা দেয় অর্থাৎ বড় বাগান, তারাও পারছে না। কারণ কস্ট অব প্রোডাকশন অনেক বেশি। ভারতের চা বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা এই উৎপাদন খরচই। তাই উৎপাদন খরচ কমানোর উপর জোর তো দিতেই হবে।

এখন ডুয়ার্স: কিন্তু ক্ষুদ্র চায়ের ক্ষেত্রে কস্ট অব প্রোডাকশন কম হলেও গুণগতমান কেমন?

বিজয়গোপাল: বিশ্বের ৬৫ শতাংশ চা আসে ক্ষুদ্র চা-শিল্প থেকে। বড় বড় চা-শিল্পগোষ্ঠীভুক্ত দেশ, যেমন— চিন,

শ্রীলঙ্কা, কেনিয়া, ভিয়েতনাম, তাদেরও অধিকাংশ চা আসে ক্ষুদ্র চা থেকেই।

এখন ডুয়ার্স: কিন্তু সাম্প্রতিককালে লক্ষ করা যাচ্ছে, বাজার ধরার জন্য হ্যাপি ভ্যালি, লোপচু, মকাইবাড়ির মতো স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানও প্যাকেট বা পাউচ টি-র উপর গুরুত্ব দিচ্ছে।

বিজয়গোপাল: দার্জিলিং চা হচ্ছে নির্দিষ্ট শ্রেণির জন্য। সকলে এর সমঝদার নয়। ইট'স ওনলি ফর এ ক্লাস। রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ২০০ থেকে ২২০ মিলিয়ন কেজির মধ্যে আমাদের রপ্তানিযোগ্য দার্জিলিং চায়ের বাজার ঘোরাফেরা করে। বিদেশে চা গেলে পেস্টিসাইডমুক্ত চা লাগবে। কারণ ওরা খুব স্বাস্থ্যসচেতন। আসলে সচেতন করতে হবে। ক্ষুদ্র চা-চাষিদের সচেতন করতে হবে, আমাদের বিজ্ঞানসম্মতভাবে চা-চাষ করতে হবে। চা ধান, পাট ইত্যাদির মতো কৃষিজ ফসল নয়। চা-পাতাকে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। টি রিসার্চ ইনস্টিটিউট অর্থাৎ চা গবেষণাকেন্দ্রের ১০০ বছরের গবেষণালব্ধ ফল হচ্ছে, ক্ষুদ্র চা-চাষ এবং গুণগত উন্নত মানবিশিষ্ট অর্থোডক্স টি— দুই-ই। আমি এলাম, দেখলাম, করলাম— ব্যাপারটা এরকম নয়। ডেডিকেশন, ডিটারমিনেশন, ডাইনামিজম প্রয়োজন। আমার জমি আছে, আমি লাগিয়ে দিলাম, বাগান করলাম, চা গাছ লাগালাম, কিন্তু বছর বছর কীভাবে অর্থ আসবে অর্থাৎ আমি আর্ন করব, সেটাও লক্ষ রাখতে হবে।

এখন ডুয়ার্স: ক্ষুদ্র চায়ের ভবিষ্যৎ কী পশ্চিমবঙ্গে এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে?

বিজয়গোপাল: বড় আনন্দের খবর, আমি আপনাকে গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, যেহেতু আমার এটা কর্মস্থল এবং আমি এখানেই থাকব, আমরা সবাই আসামের কথা বলি, আসামে এক লক্ষ স্মল টি গ্রোয়ারস আছে। তামিলনাড়ুতে ৬০ হাজার এবং পশ্চিমবঙ্গে ৪০ হাজার স্মল টি গ্রোয়ারস আছে। উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ সারা ভারতের মধ্যে ক্ষুদ্র চা অধ্যুষিত রাজ্যগুলিকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। আমাদের রাজ্যে চায়ের উৎপাদন ৩৫৭ মিলিয়ন কিলো, তার অর্ধেকটা আসে ক্ষুদ্র চা-চাষিদের কাছ থেকে। ক্ষুদ্র চা-চাষিরা চায়ের জোগান দিচ্ছে। এতে শুধু আমাদের আর্থ-সামাজিক উন্নতিই হচ্ছে না, গ্রামের যে সমস্ত মানুষ কেরালা বা অন্য জায়গায় চলে যেত, তাদের জন্য আমরা যেমন কর্মোদ্যোগ সৃষ্টি করেছি, তেমনই সরকার ক্ষুদ্র চা-চাষিদের কাছ থেকে ভাল রাজস্ব পাচ্ছে, ভ্যাট পাচ্ছে, সরকারের আয়ও বাড়ছে।

এখন ডুয়ার্স: সম্প্রতি রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার কি এমন কোনও আইন করেছে যে, ক্ষুদ্র চা-চাষিরা নিজেরাই ফ্যাক্টরি নির্মাণ করে নিজেরাই চা উৎপাদন করতে পারবে?

বিজয়গোপাল: অনেকদিন থেকেই এটা সরকারের ক্ষুদ্র চা-শিল্প নিয়ে গৃহীত নীতি। আমরা জলপাইগুড়ি জেলায় ৮৬ টা স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়েছি, এবং তিনটে ফ্যাক্টরিও করে ফেলেছি। এ বছর আমাদের লক্ষ্যমাত্রা আরও তিনটে ফ্যাক্টরি। আগামী দু'বছরে আমরা ১০টা ফ্যাক্টরি করব। আমাদের লক্ষ্য জলপাইগুড়ির ফ্যাক্টরিজাত নিজস্ব ব্র্যান্ডেড চা। জলপাইগুড়ি ওয়ার্ল্ড অ্যাটলাসেও টি টাউন। জলপাইগুড়ি বলতেই লোকে চা বোঝে। জলপাইগুড়ির এই চা-কে আমরা নিজস্ব ব্র্যান্ডনেমে পরিচয় করাতে চাই।

এখন ডুয়ার্স: শুধু কি জলপাইগুড়ি, না ভারত বা বহির্ভারত?

বিজয়গোপাল: অলরেডি আমরা রাশিয়াতে গিয়েছি আমাদের উৎপাদন নিয়ে। আমরা এ বছর মিশরে চা নিয়ে যাচ্ছি। এর পর আমাদের ইচ্ছে আছে, জার্মানিতে যাব। আমরা আস্তে আস্তে আমাদের চা-কে বিদেশের বাজারে বিপণন করার চেষ্টা করছি। আমরা রপ্তানি বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন জেলাতেও যাচ্ছি। আমরা অর্থোডক্স চা নিয়ে যাচ্ছি, আসাম চা নিয়েও যাচ্ছি, আবার ডুয়ার্সের সিটিসি চা নিয়েও যাচ্ছি। আমরা ভাল সিটিসি নিচ্ছি খুব ভাল লিকারের জন্য, অর্থোডক্স নিচ্ছি ফ্লেভারের জন্য। টি বোর্ড ভারতের বাগানগুলো কী অবস্থায় আছে, তার যে গ্রেডিং করেছে, তাতে জলপাইগুড়ির বাগানগুলোর মধ্যে ৫টা বড় বাগান, তার মধ্যে ডেঙ্গুয়াঝাড়ের গুডরিকের বাগান প্রথম হয়েছে, দ্বিতীয় হয়েছে জলপাইগুড়ি জেলার ফুর্তি বাগান, তৃতীয় হয়েছে আইভিল বাগান, চতুর্থ হয়েছে চামুর্চির পাশে এশিয়ার সবচেয়ে বড় বাগানটি। সুতরাং গ্রেডিং-এর ক্ষেত্রে ভারতে প্রথম চারটি বাগানই জলপাইগুড়ির।

এখন ডুয়ার্স: ছোট ছোট বাগান কি পরবর্তীকালে বড় বাগানের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে?

বিজয়গোপাল: দেখুন, জলপাইগুড়ি বা ডুয়ার্স এমন একটা জায়গা, যেখানে বড় বড় বাগানের ক্ষেত্রে জলপাইগুড়ির একটা সুনাম আছে, তেমনই ক্ষুদ্র চা-চাষের ক্ষেত্রেও জেলা পিছিয়ে নেই। তাই জলপাইগুড়িতে সবচেয়ে বেশি বটলিফ কারখানা। কারণ জলপাইগুড়িতে আছে ৭৬টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী। আর ১৪৬টা আছে আমাদের উত্তরবঙ্গে। এখানে যারা ক্ষুদ্র চাষিরা আছে, তারা গুণগতমানকে বজায় রেখে উৎপাদন করে। জলপাইগুড়ির চায়ের দাম সবসময়ে ১০ টাকা হলেও বেশি থাকবে বাজারের অন্যান্য চায়ের সঙ্গে নিলামের সময়। তাই জলপাইগুড়ির হৃত সম্মানকে আমরা পুনরুদ্ধার করতে চাইছি। জলপাইগুড়িতে ক্ষুদ্র চায়ের হাত ধরে অর্থনীতিতে জেলাকে পথ দেখাতে চাইছে ক্ষুদ্র চা-চাষিরা। জলপাইগুড়িতে আমরা নিজস্ব চায়ের মিউজিয়াম করার দিকে এগচ্ছি। এর জন্য ইতিমধ্যেই জমি দেখা হয়ে গিয়েছে। সেখানে কনফারেন্স রুম থাকবে, জলপাইগুড়িতে চায়ের মাধ্যমে আমরা পর্যটনের একটা নতুন সম্ভাবনা উন্মুক্ত করতে চাই। তা ছাড়া জলপাইগুড়িতে ক্ষুদ্র চা-চাষিদের জন্য একটা অফিসঘর কাম বিশ্রামাগার করার কথাও চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। কারণ ক্ষুদ্র চা-চাষিদের অনেকেই গ্রামেগঞ্জে থাকেন। আপদে-বিপদে হাসপাতালে এলে তাঁদের অনেকেই থাকার জায়গা পান না। সুলভ মূল্যে ডরমিটারির মতো ঘর যদি করা যায় তাহলে ক্ষুদ্র চা-চাষিরা হাসপাতালে আপদে-বিপদে এলে মাথা গোঁজার আশ্রয়টুকু অন্তত পাবেন। অর্থাৎ শুধুমাত্র অর্থনৈতিক নয়, অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সব দিক দিয়েই যাতে অবহেলিত জলপাইগুড়ি জেলাকে পাদপ্রদীপের আলোকে নিয়ে যাওয়া যায়, সেই লক্ষ্যে ক্ষুদ্র চা-চাষিরা আত্মপ্রত্যয়ী।

> আমরা রাশিয়াতে গিয়েছি আমাদের উৎপাদন নিয়ে। আমরা এ বছর মিশরে চা নিয়ে যাচ্ছি। এর পর আমাদের ইচ্ছে আছে, জার্মানিতে যাব। আমরা আস্তে আস্তে আমাদের চা-কে বিদেশের বাজারে বিপণন করার চেষ্টা করছি। আমরা রপ্তানি বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন জেলাতেও যাচ্ছি। আমরা অর্থোডক্স চা নিয়ে যাচ্ছি, আসাম চা নিয়েও যাচ্ছি

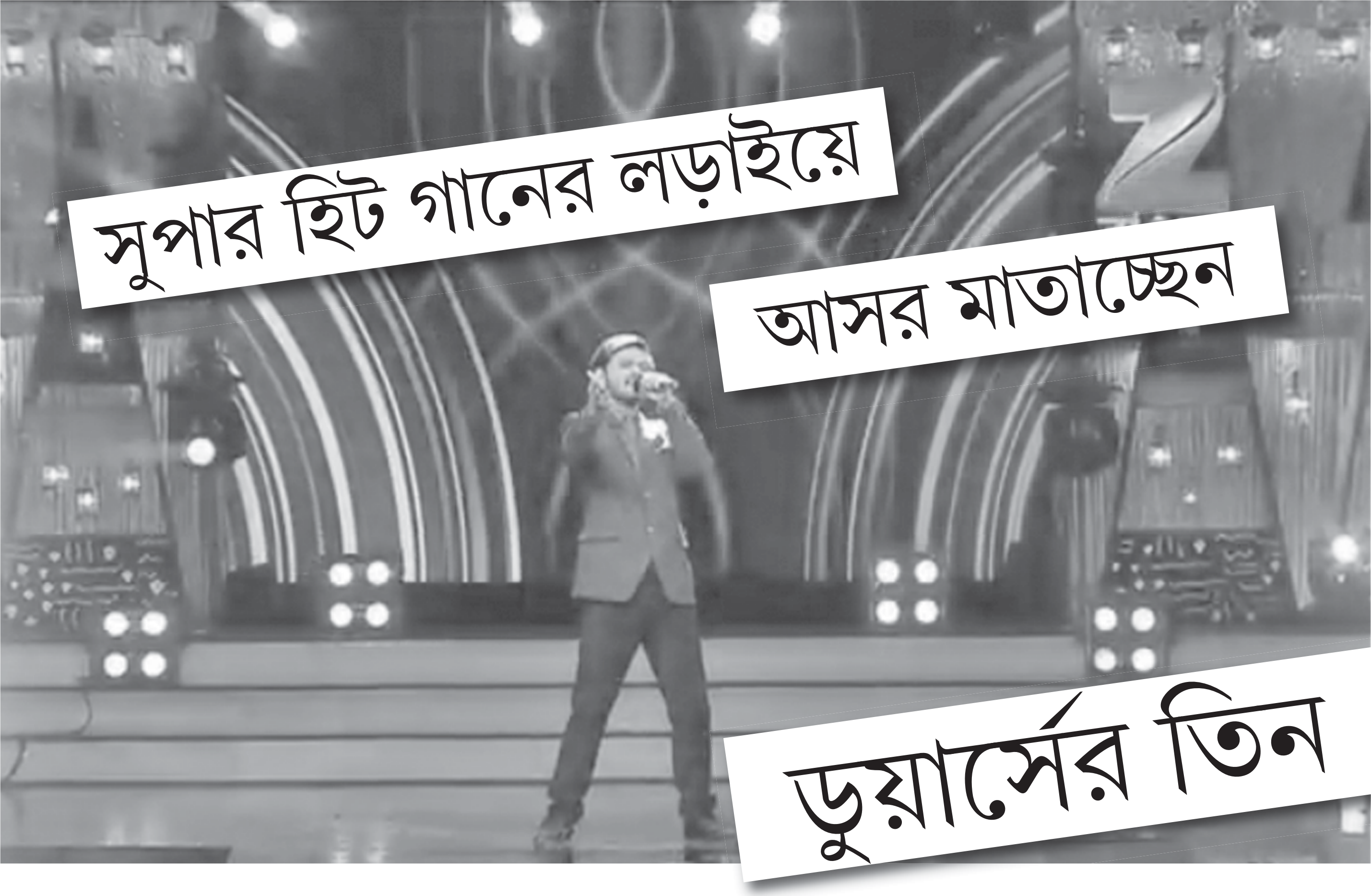

সুপার হিট গানের লড়াইয়ে আসর মাতাচ্ছেন ডুয়ার্সের তিন

যদিও এই প্রথমবার নয়, এর আগেও বাংলা টেলিভিশন চ্যানেলের জনপ্রিয়তম সংগীত প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ডুয়ার্সের প্রত্যন্ত এলাকার তরুণ প্রতিভা। কিন্তু এবার তার দাবিদার ডুয়ার্সের তিন তরুণ-তরুণী। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা সবাই, বিশ্বজুড়ে তাবড় বাংলা সংগীতপ্রেমীদের নজর তাঁদের উপরেই।

দীপায়ন রায়

ক্লাসে বেঞ্চ বাজিয়ে গান করার অপরাধে একদিন হেড স্যারের কাছে শাস্তি হয়েছিল দীপায়নের। আজ কিন্তু সেই গানের জন্যই তার নাম ছড়িয়ে পড়েছে আলিপুরদুয়ার ছাড়িয়ে সারা রাজ্যে। বিশ্বায়নের দৌলতে পৃথিবীর নানা প্রান্তের সংগীতপ্রেমী ‘সারেগামাপা’র দর্শক আজ এক ডাকে চেনে দীপায়নকে।

আলিপুরদুয়ারের ওদের বাড়ির দোতলায় বসে কথা হচ্ছিল দীপায়নের বাবা দিবাকর রায়ের সঙ্গে। এখন নিজের পরিচয় ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে ছেলের পরিচয়। জানতে চাইলাম, ‘কেমন লাগে, লোকে যখন দীপায়নের বাবা বলে আপনাকে চেনে?’ হেসে বললেন, ‘অসম্ভব আনন্দ হয়, গর্বও হয়। সব বাবা-মা-ই বোধহয় এটাই চায়, সন্তানের পরিচয়ে পরিচিত হতে।’ পেশায় সংগীতশিক্ষক দিবাকরবাবু জানালেন, ‘আমার নিজের গানের স্কুল রয়েছে, সুরতীর্থম মিউজিক কলেজ। তাই ছোটবেলা থেকেই সাংগীতিক পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছে দীপায়ন। বাড়িতে গানবাজনার চর্চা প্রথম থেকেই। দীপায়নের মা শুক্লা সরকার রায়ও ভাল গান গাইতেন। মায়ের কাছেই গানের হাতেখড়ি দীপায়নের। বেশির ভাগ সংগীতশিক্ষাটাও মায়ের কাছেই। সেই ছোট থেকেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান গাইত দীপায়ন। তবে কোনও দিন গানের জন্য দীপায়নকে জোর করা হয়নি।’ জানালেন তিনি। ছোটবেলাতেই গান শুনলে চুপ করে যেত সে। বাবা ছাত্রদের গান শেখাত, মন দিয়ে শুনত সেইসব গান। বরাবরই শান্ত এবং বাধ্য ছিল দীপায়ন, ছোট ভাই শুভায়ন ছিল ঠিক তার উলটোটা। স্টেপিং স্টোন মডেল স্কুলে পড়ার পাশাপাশি এভাবেই চলছিল গান শেখা। এর মধ্যে ‘ইন্ডিয়ান আইডল’ দেখে সাংঘাতিক অনুপ্রাণিত হয় দীপায়ন। ওর কাকুর একটা ক্যাসেটের দোকান ছিল। সেখানে পছন্দের গানগুলো বাছাই করে নিয়ে অবসর সময়ে নিজে নিজেই অভ্যাস করত। এর পর শুরু হল মিউজিক ট্র্যাক জোগাড় করা। সেই মিউজিক ট্র্যাকের সঙ্গে গান করত সে। দিবাকরবাবুর কথায়, ‘একদিন ও এসে আমাকে বলল যে, বাবা, আমি তো ট্র্যাকের সঙ্গে গান গাইছি, কিন্তু আমি কেমন গাইছি, আমার সুর চলে যাচ্ছে নাকি, আমার গলাটা কেমন আসছে তা কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি আমাকে একটা রেকর্ডিং-এর ব্যবস্থা করে দাও। তখন স্থানীয় বি সি দাস মাইক সাপ্লাইতে যোগাযোগ করি। ওটা আমার বন্ধুর দোকান। বাবাইয়ের ইচ্ছের কথা জানাতেই ও গোটা রেকর্ডিং সেটটা নিয়ে বাড়িতে চলে আসে। বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে রেকর্ডিং করে বাবাইয়ের গান। তখন ক্যাসেটের যুগ। গানগুলো শুনে,ভুল থাকলে নিজেই

ইয়ং স্টার

সেগুলো ঠিক করত।

‘এভাবেই মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে গেল দীপায়ন। রেজাল্টও ভাল করে। ইচ্ছে ছিল, গান শিখতে কলকাতায় যাবে। সুযোগও এসে গেল। রেজাল্ট ভাল হওয়ায় কলকাতার কলেজে ভরতি হতে পারল। পাশাপাশি চলল সংগীতশিক্ষকের খোঁজ। সে সময় ছেলেকে কলকাতায় রেখে পড়ানোর মতো আর্থিক সংগতি ছিল না।’ বললেন দিবাকরবাবু, ‘তবুও একটু কষ্ট করেই ছেলের দিকে তাকিয়ে ওকে কলকাতায় রাখলাম। ও যা করেছে, সম্পূর্ণ নিজে একা করেছে। আমরা দূর থেকে ওকে সহযোগিতা করেছি, ওর প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করেছি মাত্র। সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ওর। একটা চাকরি পেয়েছিল, কিন্তু ওটা সামলে গান করা যাচ্ছিল না। অগত্যা চাকরিটা ছাড়তে হয়।’

কলকাতায় এসে ফিজিক্স নিয়ে পড়া শুরু করলেও পরবর্তীতে ইংরেজি নিয়ে পড়ে দীপায়ন। নিজে যা করতে চেয়েছে, তাতে সব সময় মা-বাবার পূর্ণ সমর্থন পেয়েছে— জানাল দীপায়ন। এই সময় একটা অনলাইন গানের প্রতিযোগিতার বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে দীপায়নের। তার জন্য গানের সিডি করতে হবে। ‘রুমমেট অর্ঘ্যদা সে সময় আমাকে খুব সাহায্য করেছিল।’ বলল দীপায়ন। মূলত তারই জন্য যোগাযোগ হয় দেবাশিস গাঙ্গুলির সঙ্গে। ওঁর নিজস্ব স্টুডিয়ো আছে, রেকর্ডিংও হয়, আবার উনি গানও শেখাতেন। দীপায়নের গলা শুনে খুব ভাল লেগেছিল তাঁর, মাত্র ৯০০ টাকায় রেকর্ডিং করে দেন তিনি। এর পর স্যারের কাছে গান শেখা, সঙ্গে ভয়েস ট্রেনিং শুরু। সেখানে স্যার মাঝেমধ্যে দীপায়নকে দিয়ে বিভিন্ন গানের স্ক্র্যাচ করতেন।

স্যারের দৌলতেই সিরিয়াল ‘ঘরে ফেরার গান’-এ প্রথম গান গাওয়া। এর পর ‘দুই ভুবনের পারে’তে গান। বেশ কিছু হিন্দি গানের কথাও লিখেছে দীপায়ন। সেগুলো রেকর্ডও হয়েছে। ছোট বাজেটের হিন্দি সিনেমা ‘চিপকু’তে গান গাওয়ার সুযোগ হয় তার। এর মধ্যেই মাস্টার্স ডিগ্রি কমপ্লিট হয়, পাশাপাশি মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্টেও হাত পাকানো শুরু হয়। এই কাজে যেসব যন্ত্রপাতি লাগে, তার দাম লাখখানেক টাকা। ‘মাকে জানানোর পর বাবা-মা দু’জনেই খুব কষ্ট করে সেগুলো আমাকে কিনে দেয়।’ জানায় দীপায়ন। বলে, ‘কাজ শুরুও করেছিলাম, একজনের সঙ্গে মিউজিক ডিরেকশন নিয়ে ফাইনাল কথা হয়েও

> আরও একটা দুর্ঘটনা দীপায়নের জীবনকে ওলটপালট করে দিয়েছে। যে দিন ‘ক্যাপটেন অব দ্য ডে’ হয়েছিল, খবরটা দেবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে মাকে ফোন করে। ফোন বেজে যায়। দীপায়ন জানত না, সে দিনই তার মা পথদুর্ঘটনায় আহত হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে।

গায়ক নচিকেতার সঙ্গে

বাবা-মায়ের সঙ্গে দীপায়ন

গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎই “সারেগামাপা”র অডিশনে ডাক পাই। আমাকে এবার লাইন দিয়ে অডিশন দিতে হয়নি। কারণ গতবারের অডিশনে চান্স পেয়েছিলাম, গ্রুমিং অবধি থাকার পর গলা হঠাৎ খারাপ হয়ে যাওয়ায় বাদ চলে যাই। তখনই আমাকে জানানো হয়েছিল যে, পরের বার আর লাইন দিয়ে অডিশন দিতে হবে না। পরের রাউন্ডগুলোয় শুধু পরীক্ষা দিতে হবে। এবার আর ফিরে আসতে হয়নি। তার পরেরটা সকলেরই জানা।’

দাদার জন্য খুব খুশি ভাই শুভায়ন। বলে, ‘দাদা কলকাতা চলে যাওয়াতে খুব একা হয়ে গিয়েছিলাম। দাদার সাকসেসটা খুব ইন্সপায়ারিং। আমারও এই লাইনেই যাবার ইচ্ছে আছে।’ কথা হল দীপায়নের অর্ঘ্যদা, মানে অর্ঘ্যদীপ্ত করের সঙ্গে। সে দিন সে-ও ছিল দীপায়নের বাড়িতে। জানাল, ‘টিভিতে ওকে দেখে আনন্দ হয়, গর্ব হয়, ভীষণ ভাল লাগে। আমরা সকলেই একটা অ্যাম্বিশন নিয়ে কলকাতায় এসেছিলাম। যখন দেখি, ও সেই স্বপ্নের কাছাকাছি এগচ্ছে, সত্যিই ভাল লাগে।’

ভবিষ্যতের কথা জানতে চাইলাম দীপায়নের কাছে। বলল, ‘এদিকে তো প্রতিভার কোনও অভাব নেই, কিন্তু সেই সুযোগটা এখানের ছেলেমেয়েরা পায় না, যা কলকাতার ছেলেমেয়েরা পায়। আমার কেরিয়ারের জন্য আমাকে এখন বাড়ির বাইরে থাকতেই হবে। এখানে এখনও সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই যে, আমি এখানে আমার কেরিয়ারকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। আমার একটা চিন্তাভাবনা আছে, এখানে গানবাজনাকে যদি কোনওভাবে ডেভেলপ করা যায়, যদি কোনও আধুনিক স্টুডিয়ো তৈরি করা যায়। তবে এগুলো তো এখনই করতে পারব না, আমাকে আগে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, নিজেকে সেই জায়গায় নিয়ে যেতে হবে, তবেই এগুলো করা সম্ভব। অবসর সময়ে ভাল লাগে গিটার বাজাতে। গল্প লেখার অভ্যাস আছে। পরবর্তীতে ফিল্ম নিয়ে কাজ করার ইচ্ছে আছে। স্কুলের বিভিন্ন প্রোগ্রামে গান গাইতাম। এখন অনেকেই আমাকে চেনে। স্কুলে গানের জন্য আমি বরাবরই সকলের প্রিয় ছিলাম। হেড স্যার নিজে আমার গান পছন্দ করতেন, তবুও একদিন দুষ্টুমি করার জন্য শাস্তি পেয়েছিলাম। “সারেগামাপা”তে আসার পর অনেক বন্ধুর সঙ্গে আবার নতুন করে যোগাযোগ হয়েছে। সবাই ভীষণ খুশি।’ জানায় দীপায়ন। কালিকাদার মৃত্যুটা খুবই কষ্ট দিয়েছে দীপায়নকে। বলল, ‘কালিকাদা আমাদের বিভিন্নরকম টিপস দিতেন, গানের কিছু হিস্ট্রি গল্পের মতো করে বলতেন, তাতে আমাদের গানগুলো করতে খুব সুবিধা হত। খুব ভাল বন্ডিং ছিল সকলের সঙ্গে। কিন্তু কী যে হয়ে গেল!’

আরও একটা দুর্ঘটনা দীপায়নের জীবনকে ওলটপালট করে দিয়েছে। সদ্য মাতৃহারা হয়েছে দীপায়ন। যে দিন ‘ক্যাপটেন অব দ্য ডে’ হয়েছিল, খবরটা দেবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে মাকে ফোন করে। ফোন বেজে যায়। দীপায়ন জানত না, সে দিনই তার মা পথদুর্ঘটনায় আহত হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে। পরে বাড়ি থেকে খবর দিয়ে ওকে নিয়ে আসা হয়। সব কিছুই এত আকস্মিক যে, মেনে নিতে নিজের সঙ্গেই যুদ্ধ করতে হচ্ছে। দিবাকরবাবু বলেন, ‘ওর মায়ের ইচ্ছে ছিল একটা কথা সকলকে জানানোর। সেটা হল, ক্লাস ফাইভ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত ওর স্কুলে পড়ার জন্য একটা পয়সাও লাগেনি। স্কুলের হেড স্যার দীপায়ন ঘোষ একদিন আমাকে ডেকে বলেন যে, দীপায়নের পড়ার জন্য আপনাকে স্কুলে কোনও টাকা দিতে হবে না। উনি আমার ছেলেকে অসম্ভব ভালবাসতেন। ওঁর এই উপকার আমরা কোনও দিনও ভুলব না। মায়ের সঙ্গেই বেশি অ্যাটাচমেন্ট ছিল দুই ভাইয়ের।’ বললেন তিনি। দীপায়নের মামা গৌতম সরকার জানালেন, ‘ছেলেদের জন্য শুক্লা কলকাতার দিকে বদলির চেষ্টা করছিল, যাতে মা ওদের সঙ্গে থাকলে দুই ভাইয়ের সুবিধা হয়। কিন্তু সেসব আর কিছুই হল না।’ মা চেয়েছিলেন, তার ছেলেরা প্রতিষ্ঠিত হোক। মায়ের সেই ভালবাসার জোরেই দীপায়ন-শুভায়ন এগিয়ে যাবে। অনেক দূর যেতে হবে দীপায়নকে, এখন যে মায়ের স্বপ্ন পূরণ করার পালা।

বন্দনা দত্ত

আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকার লিচুতলা স্টপ থেকে বাড়িটা বেশ ভেতরে, অন্তত টেলিফোনে পথনির্দেশ শুনে খুঁজে বের করতে বেগ পেতে হয়। কিন্তু সে সমস্যার সুরাহা হয়ে যায় স্থানীয় যে কাউকে একটিমাত্র প্রশ্নে, বন্দনাদের বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন? বন্দনা, মানে ডুয়ার্সের আলিপুরদুয়ারের বন্দনা দত্ত। জি বাংলা ‘সারেগামাপা’তে যার গানের জন্য গোটা বিশ্ব আজ এক ডাকে চেনে আলিপুরদুয়ারকে। গানের জন্যই দর্শকের কাছে সে আজ যেমন পরিচিত মুখ, তেমনই জনপ্রিয়।

বন্দনার গল্প শুনব বলে সে দিন সন্ধ্যায় গিয়েছিলাম ওদের বাড়ি। খুবই সাধারণ বাড়িঘর। বাবা-মা-ভাই আর বন্দনাকে নিয়ে ছোট্ট পরিবার। বাড়িতে গোরু, হাঁস, মুরগি যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে বন্দনার পোষা বেড়াল, আদরের কুকুরও। বাড়ির লোকেদের আন্তরিকতার কোনও অভাব নেই। গল্পে গল্পে উঠে এল বন্দনা, মানে তাদের আদরের বুড়ির বেড়ে ওঠার নানা কথা।

বন্দনার বাবারা পূর্ব পাকিস্তান থেকে রিফিউজি হয়ে কলকাতার দক্ষিণেশ্বরে চলে আসেন। দাদু কালীপ্রসন্ন দত্ত ছিলেন বেহালাবাদক। কলকাতার সংগীতজগতে অবাধ বিচরণ ছিল তাঁর। ঠাকুমা অসম্ভব সুন্দর গান গাইতেন। বন্দনার গলা একদম তার ঠাকুমার মতো, জানালেন বন্দনার বাবা। ছোট থেকেই বন্দনা যেন সুর খুঁজে বেড়াত। বন্দনার বাবা জীবনকৃষ্ণ দত্ত ছিলেন রেলের কর্মচারী। মা গৃহবধূ। চাকরিসূত্রে আলিপুরদুয়ারে আসেন বন্দনার বাবা। রেলের চাকরি থেকে ভলান্টিয়ারি রিটায়ারমেন্ট যখন নেন, তখন বন্দনার বয়স মাত্র তিন। সেই ছোট্টবেলা থেকে গান শেখা শুরু বন্দনার। হারমনিয়ামের রিড চেনায় পাড়ার চিত্রলেখা বউদি। একদিন সেই

বউদিই বন্দনার বাবাকে বলে, ‘কাকু, আমি ওকে কী শেখাব, ও তো আমার আগে আগে চলে যায়!’ তারপরই আলিপুরদুয়ারের নীহাররঞ্জন চক্রবর্তীর কাছে প্রথাগত সংগীতশিক্ষা শুরু হয় বন্দনার। তবলায় সংগত করতেন সঞ্জয় সেন। খুব যত্নের সঙ্গে বন্দনাকে তালিম দিয়েছেন নীহারবাবু, জানালেন বন্দনার বাবা। একবার কোনও গান শুনলেই হুবহু তা তুলে ফেলত বন্দনা। ক্লাস এইট পর্যন্ত শেখার পর নীহারবাবু প্রয়াত হলে বেশ কিছুদিন গান বন্ধ থাকে তার। বাড়িতেই রেওয়াজ চলে। এর পর আবার ক্লাস টুয়েল্‌ভে গানের তালিম দিতে আসেন ওখানকারই সংগীতশিক্ষক অনুমাধব সরকার। ছাত্রীকে নিয়ে এখন গর্বের অন্ত নেই তাঁর। জানালেন, বন্দনার গলা এক্কেবারে অন্যরকম। যে কোনও গান আয়ত্ত করতে ওর একদম সময় লাগে না। বন্দনাকে সন্তানের মতো করে নিজের সম্পূর্ণটা উজাড় করে দিয়েছেন তিনি। ‘ওকে যখন টিভিতে দেখি, সে এক অসম্ভব অনুভূতি হয়— যা বলে বোঝাতে পারব না।’ বললেন অনুমাধববাবু।

বছর তিনেক আগে যোগাযোগ হয় গায়ক রথীজিতের সঙ্গে। বন্দনার গান শোনার পর তার প্রতিক্রিয়া ছিল, এত দেরি করে এলে কেন? স্যারের কাছে গান শেখার পাশাপাশি কলকাতায় চলে রথীজিতের কাছে গানের বিভিন্ন টেকনিক্যাল ট্রেনিং। মাসে দু’বার করে আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে কলকাতায় আসত বন্দনা। প্রথম দিকে ভাইয়ের সঙ্গে এলেও পরে একাই কলকাতায় আসত সে। সেইসব দিনের লড়াইয়ের কথা জানতে চাইলে বন্দনার বক্তব্য, ‘আমাদের ডুয়ার্সে সুযোগের বড় অভাব। গান হয়ত শেখা যায়, কিন্তু কেরিয়ার করার কথা ভাবলে অনেক ছোটখাটো বিষয়, অনেক টেকনিক্যাল বিষয় অজানা থেকে যায়। আধুনিক প্রযুক্তির কোনও সুবিধা নেই ডুয়ার্সে। তাই কলকাতায় আসতে হয়েছিল। রথীজিৎদাদার কাছে ট্রেনিং না নিলে এত বড় জায়গায় গান করার সুযোগ হয়ত পেতাম না।’

প্রথমে নেতাজি বিদ্যাপীঠ, পরে জিৎপুর হাই স্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক। ক্লাস ফাইভ থেকে আজ পর্যন্ত বন্ধুত্ব অটুট রয়েছে বন্দনা আর শিবানীর। তার কাছেই জানা গেল স্কুলজীবনের ঘটনাগুলো। শান্তশিষ্ট স্বভাবের বন্দনা বরাবরই মুখচোরা। তবে গান ছিল তার কাছে সব অবহেলার একমাত্র যোগ্য জবাব। গানের হাত ধরেই একসময় স্কুলে শুধু বন্ধুদের কাছেই নয়, শিক্ষকদের কাছেও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে সে। জিৎপুর স্কুলে নবীনবরণের সময় বন্দনা গানে নাম দেওয়ায় অনেকেই অবাক হয়েছিল। বলেছিল, ও আবার কী গান করবে! কিন্তু প্রায় সকলের শেষে গান করতে উঠে একটা গানে থামতে পারেনি বন্দনা। সকলের অনুরোধে বেশ কয়েকটা গান সে দিন করতে হয়েছিল বন্দনাকে। সে দিন বন্ধুকে নিয়ে খুব গর্ব হয়েছিল শিবানীর। ক্লাস ইলেভেনে কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে একটা দল বানিয়ে এবিটিএ-তে একটা সংগীত প্রতিযোগিতায় নাম দেয়, কলকাতা থেকে সেবার পুরস্কার নিয়ে ফিরেছিল তারা। আলিপুর ডুয়ার্স উৎসবেও প্রথম হয়েছে বন্দনা।

> আমাদের ডুয়ার্সে সুযোগের বড় অভাব। গান হয়ত শেখা যায়, কিন্তু কেরিয়ার করার কথা ভাবলে অনেক ছোটখাটো বিষয়, অনেক টেকনিক্যাল বিষয় অজানা থেকে যায়। আধুনিক প্রযুক্তির কোনও সুবিধা নেই ডুয়ার্সে। তাই কলকাতায় আসতে হয়েছিল।

পেনশনের টাকায় সংসার চলে। তবুও মেয়েকে গান শেখাবার জন্য সবরকম সুযোগ করে দেবার চেষ্টা করেছেন জীবনকৃষ্ণবাবু। বললেন, ‘সবই ঈশ্বরের দান, সঙ্গে ওর নিষ্ঠা আর একাগ্রতা। কলেজে পড়ার সময় ইন্ডিয়ান আইডল-এ একবার অডিশন দিয়েছিল। কিন্তু তখনও হিন্দি গান জানত না

এবিটিএ সংগীত প্রতিযোগিতায় বন্ধুদের সঙ্গে কিশোরী বন্দনা

বন্দনার বাবা জীবনকৃষ্ণ দত্ত

বন্দনার কথা শোনাচ্ছেন ভাই সুজনকৃষ্ণ, মা, বন্ধু শিবানী ও দিদিমা

বন্দনা। একটা গানকে হাতিয়ার করে শেষ রাউন্ড পর্যন্ত গিয়ে আর পারেনি। তারপর বাংলা “সারেগামাপা”তে অডিশন। সেবারও খালি হাতে ফিরে আসতে হয় তাকে। শিলিগুড়িতে এবারের অডিশনে চান্স পায়। তারপর কলকাতা। বাড়ি থেকে এর আগে কোনও দিন কোথাও গিয়ে থাকেনি।’

বন্দনার মা বীণা দত্ত দেখালেন মেয়ের হাতে তৈরি বিভিন্ন সফ্‌ট টয়। জানালেন, শুধু গান নয়, ফুলগাছের প্রতিও দারুণ ঝোঁক রয়েছে বন্দনার। গোরুর দুধ ছেঁকা থেকে শুরু করে নিখুঁত গোল রুটি বানাতে পারে সে, কিন্তু রান্নাটা একদম করতে পারে না। গানের সূত্রে বিভিন্ন কাপ-মেডেলে ঘর ভরতি। এখন শান্ত হলে কী হবে, ছোটবেলায় নাকি ভীষণ দুষ্টু ছিল বন্দনা। আড়াই-তিন বছর বয়সে বাচ্চাদের সাইকেল রিকশা চালিয়ে চলে যেত বাবার অফিস দেখার জন্য। আর এদিকে পাড়াসুদ্ধ লোক তাকে খুঁজছে। সে দিন বাড়িতে গিয়ে দেখা হল বন্দনার দিদার সঙ্গে। নাতনির গান শোনার জন্য ওই তিনটে দিন সন্ধ্যা থেকেই টিভির সামনে বসে থাকেন বন্দনার দিদা। সে দিনও তা-ই ছিলেন। বললেন, ‘টিভিতে আমাদের বুড়ি গান করছে দেখলে আনন্দে চোখে জল চলে আসে।’

গান নিয়ে এখনও পর্যন্ত যতটুকু করেছে, তাতে অনেকেরই অবদান থাকলেও ছোট ভাই সুজনের উৎসাহ ছিল সবচেয়ে বেশি, জানায় বন্দনা। কয়েক বছর আগের কথা, কোচবিহারের খাগড়াবাড়িতে ‘উত্তরের সারেগামা’ বলে একটা প্রতিযোগিতা হচ্ছিল। সেই খবর পেয়ে একদিন বাড়ির কাউকে কিছু না বলে দুই ভাইবোন মিলে সেখানে চলে যায়। এদিকে বাড়ির লোকেরা চিন্তা করছে। রাত ১২টার সময় তারা ফেরে, হাতে বিশাল একটা কাপ আর দশ হাজার টাকার চেক। উচ্চমাধ্যমিকের পর দিদির বিয়ে প্রায় ঠিক করে ফেলেছিলেন বাবা-মা। সে দিন সুজনই সবচেয়ে বেশি প্রতিবাদ করেছিল। তিন দিন ভাই আর দিদি কিচ্ছু খায়নি। তাদের জেদের কাছে হার মানেন বাবা-মা। গান চলতে থাকে নিজের গতিতে। দিদির এই জনপ্রিয়তা তার কাছে ভীষণ অনুপ্রেরণার, জানাল সুজন— বন্দনার ফ্রেন্ড, ফিলোজফার অ্যান্ড গাইড। দিদিকে আরও উঁচুতে দেখতে চায় সে। নিজেও ভাল গান গায়, দিদির মতো সে-ও রবীন্দ্রভারতী থেকে ডিস্ট্যান্সে এমএ করছে।

এত প্রচারের আলোয় থেকেও এখনও বাড়ির জন্য মন খারাপ করে তার। ঘরকুনো স্বভাবের জন্য মা তাকে একদিন বলেছিল বাড়ি থেকে বার হয়ে যেতে, কারণ বাইরে না গেলে তার জীবনে কোনও উন্নতি হবে না। কথাটা বড্ড মনে লেগেছিল বন্দনার। সেই জেদেই ‘সারেগামাপা’র অডিশন দিতে যাওয়া। ভবিষ্যতের ইচ্ছে জানতে চাইলে বন্দনা জানায়, ‘এখন গান নিয়েই যা করার করব। জীবনে যদি দাঁড়াতে পারি, তবে ইচ্ছে আছে, আমাদের ওখানে একটা গান শেখানোর স্কুল খুলব। প্রচুর ভাল ভাল গায়ক-গায়িকা রয়েছে আমাদের ডুয়ার্সে। তারা গান ঠিকঠাক শেখে, কিন্তু আধুনিক ট্রেনিংটা পায় না। তাদের জন্য যদি কিছু করতে পারি, সেই চেষ্টা করব।’

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

ঊর্মি চৌধুরী

ঊর্মি তখন খুব ছোট, দুই কি তিন বছরের হবে। ওর দুরন্তপনায় সকলে অস্থির হয়ে থাকে সব সময়। বাবা-মায়ের সঙ্গে ঠাকুমাও সারাটা দিন দৌড়াচ্ছেন ওর পিছন পিছন। একদিন হয়েছে কী, কোত্থাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ঊর্মিকে। খোঁজ খোঁজ খোঁজ, কোত্থাও নেই। বাড়ি ছেড়ে খুঁজতে যাওয়া হল পাশের বাড়িতে। সেখানেও নেই। যখন সকলের চিন্তার পারদ চড়চড় করে উপরের দিকে উঠছে, তখন তিনি বেরিয়ে এলেন আলমারির পাশের সরু ফাঁক থেকে। সেই ঊর্মিকে খুঁজতে হলে এখন শুধু ওর নামটাই যথেষ্ট। ঊর্মি চৌধুরী। নাতনির কথা বলতে বলতে উচ্ছ্বাসে মুখ থেকে হাসি আর সরছিলই না বৃদ্ধা ঠাকুমার। এখন সেই মফস্‌সলের সহজ- সরল মেয়েটার দিন কাটছে কলকাতায় জি বাংলার পার্পল স্টুডিয়োর নিয়মানুশাসনের গণ্ডির মধ্যে, যা ওর গানের জীবনের জন্য এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার সিঁড়ি। জি বাংলার ‘সারেগামাপা’তে

ওপরে বন্ধুদের সঙ্গে হইচইয়ের মুহূর্তে ঊর্মি

বাঁ দিকে ডুয়ার্সের উন্মুক্ত প্রকৃতির বুকে সবান্ধবে বন্দনা

আপনার উপস্থিতি একান্ত কাম্য

কালজানি নাট্য উৎসব-২০১৭

Nindra Motors &
Sky Drops Drinking water Presents

আয়োজনে- সংঘশ্রী যুব নাট্য সংস্থা, আলিপুরদুয়ার

সহযোগিতায়- আলিপুরদুয়ার পৌরসভা ও প্রেরণা মুক্ত সাংস্কৃতিক মঞ্চ।

Media Partner

এখন ডুয়ার্স

তারিখ	সময়	কোন জায়গার দল	দলের নাম	নাটকের নাম	নির্দেশক
০১/০৪/২০১৭	৬টা	কোচবিহার	বর্ণনা	এই করেছো ভালো	বিদ্যুৎ পাল
০১/০৪/২০১৭	৭-১৫	শিলিগুড়ি	ইঙ্গিত	আপনজন	আনন্দ ভট্টাচার্য
০১/০৪/২০১৭	৮-৩০	গাজল	বিষাণ	সেঁথুয়া	তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়
০২/০৪/২০১৭	৬টা	মালবাজার	মাল অ্যাক্টওয়ালা	বিরতির পর	সুধাংশু বিশ্বাস
০২/০৪/২০১৭	৭-১৫	মাথাভাঙ্গা	গিলোটিন	ডেথ সার্টিফিকেট	নারায়ণ সাহা
০২/০৪/২০১৭	৮-৩০	জলপাইগুড়ি	রূপায়ণ	হীরামন	দীপঙ্কর রায়
০৩/০৪/২০১৭	৬টা	গয়েরকাটা	রিডিং ক্লাব	পাখি	কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়
০৩/০৪/২০১৭	৭-১৫	কোচবিহার	আই.পি.এ	জীবন এবং	স্নেহাশিস চৌধুরী
০৩/০৪/২০১৭	৮-৩০	রায়গঞ্জ	বিবেকানন্দ নাট্যচক্র	পৃথার ঘর	সিতেন চক্রবর্তী বিমলকৃষ্ণ সরকার
০৪/০৪/২০১৭	৬টা	কোচবিহার	ব্রাত্য সেনা	রবীন্দ্রনাথের চণ্ডালিকা অবলম্বনে অচ্ছুত	তমোজিৎ রায়
০৪/০৪/২০১৭	৭-১৫	কোলকাতা	রাণিকুঠি আঙ্গিক	জীয়ন কন্যা	সুশান্ত মজুমদার
০৪/০৪/২০১৭	৮-৩০	কোলকাতা	তিলজলা ঋতু	অদ্ভুত	জয়ন্তদীপ চক্রবর্তী
০৫/০৪/২০১৭	৬টা	সেতার বাদন		ডাক্তার মেঘনাদ ভৌমিক	
০৫/০৪/২০১৭	৭-১৫	কোলকাতা	বেহালা ব্রাত্যজন	**সওদা** অভিনয়ে দেবশঙ্কর হালদার ও সৈঁজুতি মুখোপাধ্যায়	সুপ্রিয় চক্রবর্তী

অনুগ্রহ করে কার্ডটি সঙ্গে আনবেন।

১লা এপ্রিল থেকে ৫ই এপ্রিল পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধে ঠিক ৬টা থেকে শুরু কালজানি নাট্য উৎসব - ২০১৭-এ আপনাকে স্বাগত জানাই।

স্থান- ম্যাক উইলিয়ম ইনস্টিটিউট,
মায়া টকিজ, আলিপুরদুয়ার।

প্রায় রোজই দেখা যায় ঊর্মি চৌধুরীর মুখ, শোনা যায় ওর গান। স্ক্রিনের বাইরের দিনযাপনেও এখন শুধু গানই ওর সর্বক্ষণের সঙ্গী। ঘুম থেকে উঠে রুটিনমাফিক কাজকর্মের পাটটুকু চুকিয়ে চলে যেতে হয় ক্লাসে, গ্রুমিং চলে সারাটা দিন।

ঊর্মির ময়নাগুড়ির বাড়িতে যখন পৌঁছালাম, সবে দুপুর গড়িয়েছে। দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে আমাদের পৌঁছানোর অপেক্ষাই করছিলেন ঊর্মির বাবা-মা। টিনের চাল, সামনে উঠোন, গেট-মাঠ পেরিয়ে বাড়ির চৌহদ্দিতে ঢুকতেই একটা বড় কুল গাছ। আমাদের নিয়ে গিয়ে বসতে দেওয়া হল এক্কেবারে ঠাকুমার ঘরে। বিছানায় বসে আছেন তিনি, সামনের চেয়ারে আমরা বসলাম। পরিচ্ছন্ন ঘরে অকারণ সাজের কৃত্রিমতা নেই। শহুরে চাকচিক্যের অপ্রয়োজনীয় আড়ম্বর এখনও ঢুকে পড়েনি ঊর্মির ছাপোষা আটপৌরে পরিবারের মধ্যে। জেঠুর সঙ্গে দেখা হল, দেখা হল পিসেমশাইয়ের সঙ্গেও। সকলের কত যে স্নেহের মেয়ে ঊর্মি তা তাঁদের চোখ-মুখের ভাষাই বলে দিচ্ছিল। ঊর্মিকে নিয়ে অনেকক্ষণ কথা বললাম সকলের সঙ্গে। পরিবারের মধ্যে কারও কোত্থাও এক বিন্দুও অহংকার চোখে পড়ল না।

> রবীন্দ্রভারতীতে পড়ার সময়ই ওর শিক্ষকরা ওকে গাইড করেন, যাতে ও ফোক সং-এর দিকে যায়। গেলও তা-ই। তৈরি করল নিজের সিগনেচার ব্যান্ড ‘একতারা’। গান শেখা আর তার সঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পারফর্ম করা যখন চলছিল, তখন ময়নাগুড়িতে নিজের বাড়ির মাঠে তার উদ্যোগেই শুরু হয় রবীন্দ্রভারতীর ঢঙে বসন্ত উৎসবের আয়োজন।

‘ঊর্মি’ এবং ‘গান’— এ দুটো যে কী করে একাকার হল, সে ব্যাপারে আশ্চর্য সকলেই। বাড়িতে কোনওরকম সাংস্কৃতিক পরিবেশই ছিল না ওর ছোটবেলায়। না ছিল গানবাজনার চল, না ছিল নাচের পরিবেশ। কিন্তু অদ্ভুতভাবে মেয়েটার মধ্যে নাচের প্রতি অদম্য ঝোঁক দেখা যেতে লাগল খুব অল্প বয়স থেকে। স্কুলে, পাড়ায়, এর-ওর বাড়ি গিয়ে নাচ করত মনের আনন্দে, নিজের খুশিতে। শিখত না কোথাও। বাড়ি থেকে সায় ছিল না, আবার বারণও ছিল না। আসলে ওর নাচ নিয়ে ভেবে সময় নষ্ট করার মতো বিলাসিতা ছিল না কারও। তখন ময়নাগুড়ি গার্লস-এ পড়ছে ঊর্মি। ক্লাস এইট-নাইনে উঠতে উঠতে দেখা গেল, নাচের পাশাপাশি গানের প্রতিও ওর তেমনই আগ্রহ। প্রতিবেশী একটি মেয়ে গান গাইত, ঊর্মি তার পাশে বসে শুনত। শুনতে শুনতে গলায় তুলেও ফেলত। একদিন তার গান শেখার ক্লাসে ঊর্মিকে নিয়ে গেল সে। কিন্তু ব্যাস, ওই পর্যন্তই। মনে মনে খুব ইচ্ছে করত একটু হারমনিয়াম বাজাতে। কিন্তু উপায় তো নেই। কোথায় পাবে হারমনিয়াম? কে দেবে? বাবার কাছে চাওয়ার কোনও উপায় নেই। কারণ, হারমনিয়াম কিনে দেবার মতো সামর্থ্য নেই বাবার। অনেক কষ্টের উপার্জনের টাকা। পাড়ার আর-একজনের কাছে হারমনিয়াম ছিল। ও যেতে লাগল তার বাড়িতে। সেখানে গিয়ে হারমনিয়াম বাজানোর শখ একটু হলেও মিটল বটে, কিন্তু নতুন গানগুলো অভ্যাস করতে পারত না। কিন্তু ভিতরে অদম্য উৎসাহ। বাবা দেখলেন, বিভিন্ন মহল থেকে তাঁর মেয়ের গানের গলা নিয়ে প্রশংসা ভেসে আসছে, তাই তালিম নেওয়ার জন্য ঠিক করে দিলেন একজন ভাল শিক্ষককে— অশোক রায়। কিন্তু এতেও সমস্যা মিটল না। শুধু মাস্টারমশাইয়ের কাছে যাওয়া-আসাটাই চলতে লাগল, বাড়িতে একটা হারমনিয়াম না থাকলে কি রেওয়াজ করা যায়? গান শেখা চলছে খালি গলায়। এরও বেশ কিছুদিন পর বাবা কষ্টেসৃষ্টে একখানা সেকেন্ড হ্যান্ড হারমনিয়াম কিনে দিলেন মেয়েকে। এই হল ঊর্মির গানের পথে যাত্রা শুরু। সংগীতের মধ্যে ডুবে গেল ঊর্মি। অশোক রায়ের পরবর্তী শিক্ষক হলেন জলপাইগুড়ির দেবাশিস বাগচি। ময়নাগুড়ি থেকে উচ্চমাধ্যমিকের পর ঊর্মি চলে গেল কলকাতায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক হতে। এ যাবৎ যদিও রবীন্দ্রসংগীতই ছিল ওর একমাত্র সাধনা, তবু পাশাপাশি

ঊর্মিদের ময়নাগুড়ির বাড়িতে, ছবিটি তুলেছেন নীলাঞ্জনা সিন্‌হা

চলছিল বিষ্ণুপুর ঘরানায় ধ্রুপদী সংগীতের তালিম। স্নাতকোত্তরের পর ডক্টরেট করার ইচ্ছে ছিল ঊর্মির। কিন্তু জি বাংলা ‘সারেগামাপা’র অডিশনে এভাবে সুযোগ এসে যাবে, তার জন্যে মনটা তৈরি ছিল না তখনও। জি বাংলার প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ঊর্মিসহ ওর বাড়ির সকলে। ‘গ্রাম-বাংলার একটা মেয়েকেও যে এভাবে একটা এত বড় প্ল্যাটফর্ম দেওয়া যায় তা জি বাংলা দেখিয়ে দিল।’ বললেন ঊর্মির বাবা। এখন জি-এর সঙ্গে কাজ করলেও এর পর পড়াশোনাটা অবশ্যই শেষ করবে ও। রবীন্দ্রভারতীতে পড়ার সময়ই ওর শিক্ষকরা ওকে গাইড করেন, যাতে ও ফোক সং-এর দিকে যায়। গেলও তা-ই। তৈরি করল নিজের সিগনেচার ব্যান্ড ‘একতারা’। গান শেখা আর তার সঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পারফর্ম করা যখন চলছিল, তখন ময়নাগুড়িতে নিজের বাড়ির মাঠে তার উদ্যোগেই শুরু হয় রবীন্দ্রভারতীর ঢঙে বসন্ত উৎসবের আয়োজন। এখন ময়নাগুড়িতে না থাকলেও অনুষ্ঠানটি কিন্তু ঠিকঠাকই চলে।

কথা বলতে বলতে চোখ ভিজে উঠছিল বাবার। মেমেন্টো, সার্টিফিকেট, মেডেল—সব সাজিয়ে দিলেন আমাদের সামনে। বললেন, ‘আমার মেয়ে বলেছে, বাবা, আমি আমার দুটো শখ পূরণ করতে চাই। প্রথমে একটা স্কেল চেঞ্জার হারমনিয়াম কিনব, আর তারপর আমাদের বাড়িতে একটা ওয়েস্টার্ন স্টাইলে বাথরুম বানাব।’ তারপর বললেন, ‘আমার মেয়েটাকে আজ পর্যন্ত একটা স্কেল চেঞ্জার কিনে দিতে পারিনি আমি। ও ওই ভাঙাচোরা, সারাই করা সেকেন্ড হ্যান্ড হারমনিয়াম দিয়েই চালিয়ে গেল। তবে হ্যাঁ, ওর গানের জন্য কোথায় না কোথায় নিয়ে গিয়েছি আমি। জি বাংলার অডিশনের দিনও তো, কী ভীষণ গরম, মাথার উপর কড়া রোদ্দুর, উপচে পড়া ভিড়... এখন আমার সব পরিশ্রম সার্থক। মেয়ে আমার উপযুক্ত সম্মান রেখেছে।’ বারবার বলতে লাগলেন, ‘সবাই ছেলে ছেলে করে, কিন্তু আমি মেয়ের বাবা হয়ে বলছি, একটা উপযুক্ত মেয়ে দশটা ছেলের সমান হতে পারে।’ কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্যর মৃত্যুর পর আর সবার মতোই ভীষণভাবে ভেঙেপড়েছে ঊর্মি। অত্যন্ত মনোযোগী এবং উপযুক্ত ছাত্রী ছিল ও কালিকাপ্রসাদের, বিশেষ করে লোকগান যখন ওর বিষয়। শান্তনু মৈত্র-সহ জি পরিবারের সকলের কাছে ঊর্মি অত্যন্ত স্নেহের, ভালবাসার।

ফিরে আসার সময় ঊর্মির মা বললেন, ‘আমার গর্ব এটাই, আমার মেয়ে সকলের কাছে ময়নাগুড়িকে পৌঁছে দিল। যারা ময়নাগুড়িকে চিনত না, জানত না, তারাও এখন আমাদের এই ছোট মফস্‌সল শহরটার নাম জানল, আমার মেয়ে তাদের চেনাল। ময়নাগুড়ির মানুষরাও এতে দারুণ খুশি।’

শ্বেতা সরখেল

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:12,000
Full Page, B/W: 8,000
Half Page, Colour: 7,500
Half Page, B/W: 5,000
Back Cover: 25,000
Front Inside Cover: 15,000
Back Inside Cover: 15,000
Double Spread: 20,000

Special Rates for Local Trade only

Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {19.5cm (W) X 27 cm (H)}, Non Bleed {16.5cm (W) X 23 cm (H)}, Half Page Horizontal {16.5cm (W) X 11.2 cm (H)}, Vertical {8 cm (W) X 23 cm (H)}, Strip Ad Vertical {5cm (W) X 23 cm (H)}, Horizontal 16.5 cm (W) X 7.5 cm (H), 1/4 Page 8 cm (W) X 11 cm (H), 1/6 Page {5cm (W) X 11.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2016 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

কোলাখাম

নতুন জেলা কালিম্পঙে

পর্যটকদের আমন্ত্রণের খোলা খাম

‘সাব, ডরো মৎ। ওসব আদমিকো কুছ নহি করতা, স্রিফ কালা ভালু ছোড়কে।’ হেমন্তর কথা শুনেই তো আঁতকে উঠি। কালা ভালু অর্থাৎ ‘হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার’। তার সামনে দৈবাৎ পড়ে গেলেই মুশকিল। ভীষণ হিংস্র নাকি। তেড়ে এসে আক্রমণ করে। একটু থেমে হেমন্ত বলে প্রায় স্বগতোক্তি করে, ‘ইস বনমে কালা ভালু বহুত হ্যায়।’ পথ চলতে চলতে আমাদের গাইড হেমন্ত গল্পচ্ছলে বলে চলেছে এই অরণ্যের হিংস্র বন্য জন্তুদের কথা। লেপার্ড, বুনো কুকুর, বুনো শুয়োর আর হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ারদের কথা। আমাদের অর্থাৎ আমাদের দুই বাবার মুখের অবস্থা দেখেই উপরের কথাগুলো বলেছিল হেমন্ত।

চলতি নাম হেমন্ত। আসল নাম হেমকুমার রাই। কোলাখামের সদ্যনির্মিত আধাসমাপ্ত রিসর্ট ফ্ল্যাইক্যাচার-এর ম্যানেজার। হোমস্টে। সাদামাঠা। কিন্তু আন্তরিকতা, সুস্বাদু খাবার পরিবেশন এবং পক্ষী বিশেষজ্ঞ তথা অভিজ্ঞ গাইডের কথা আমাদের বলেছিলেন বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য অর্থাৎ এই কটেজটির মালিক। বলেছিলেন, ‘আপনারা এমন একজন ম্যানেজার পাবেন, যে সদাহাস্যময়, ভদ্র, সভ্য, শিক্ষিত এবং কোলাখামের পাহাড়-জঙ্গলকে হাতের তালুর মতোই চেনে।’ আমাদের দুই পরিবারের দুই ছেলে শৌনক অর্থাৎ আমার ছেলে এবং ইন্ডিয়ান অয়েল, রানিনগরের উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনিয়ার চন্দন দাসের ছেলে চয়নের একাদশ শ্রেণির পরীক্ষা শেষ। দু’জনেরই অসম্ভব ছবি তোলার নেশা, তা-ও আবার পশুপাখির। এ কথা শুনেই বিশ্বনাথবাবুর প্রতিক্রিয়া, ‘আমার কটেজের ব্যালকনিতে বসলে আপনি কত পাখি চান?’ কথাটা যে মিথ্যা ছিল না, তার প্রমাণ শৌনকের ক্যামেরায় বন্দি এই পাখির ছবিগুলো। রুফাস সিবিয়া, ভার্ডিটার ফ্লাইক্যাচার, স্কারলেট ফিঞ্চ।

সদ্য গঠিত হয়েছে কালিম্পং জেলা। আর কালিম্পং জেলার অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র লাভা আর লাভার পাশেই পশুপাখিদের স্বর্গরাজ্য নেওড়া ভ্যালি জঙ্গলের অন্তর্গত একটি গ্রাম কোলাখাম। একদিকে দিগন্তবিস্তৃত সবুজ বন, অন্য দিকে গভীর খাদ আর খাদের ঘন সবুজের মধ্যে দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার সপার্ষদ উপস্থিতি মেঘমুক্ত দিনে এক মায়াবী পরিবেশ রচনা করে। আর তারই মাঝে পাহাড়ের গায়ে আটকে থাকা ছবির মতো সুন্দর গ্রাম কোলাখাম। প্রায় ৬১০০ ফুট উঁচুতে নেওড়া ভ্যালি ন্যাশনাল পার্কের কোলে লাভা থেকে ১২ কিমি দূরে অবস্থিত এই গ্রাম থেকে পক্ষী পর্যবেক্ষণ, কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শন এবং ছাগিয়া ফল্‌স দর্শন অসাধারণ।

হিমালয়ের নিঝুম গভীর আদিম অরণ্যের মধ্যে দিয়ে ক্রমাগত পাহাড়ের চড়াই ভাঙা বেশ ক্লান্তিকর, একঘেয়ে। এ পাহাড়ের বিস্তীর্ণ উপত্যকা নেই, দৃষ্টি প্রসারিত হবার সুযোগ পায় না, ঘুরে-ফিরে বিশাল বিশাল গাছের দেওয়ালে বাধা পায়। এখানে গাছেদের আগা দেখা যায় না, দেখা যায় না আকাশ। ঘন পাতার চাঁদোয়ায় ঢাকা পড়ে উধাও আকাশ। এইসব মহীরুহর শেওলা-মোড়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাণ্ডের পাশ দিয়ে পায়ের গোছভরা ঝরা পাতা ভরতি

পথে শুধু একঘেয়ে পথ চলা। অসাধারণ সৌন্দর্যময় জেলা কালিম্পং পর্যটনের খনি। লাভাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই পর্যটনের বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু কোলাখাম? এখনও ভার্জিন বিউটি কোলাখামে যাওয়ার মূল পথটি যে কোনও মানুষকেই পীড়া দেয়। একেবারে দুর্গানাম জপ করার মতো ব্যাপার। লাভা থেকে রিশপের পার্বত্য পথটিরও একই রূপ। পুরো পথ বোল্ডারময়— পথ না বলে একে ‘অপথ’ বলাই শ্রেয়। এমনিতে গরিব পাহাড়ি মানুষগুলো গাড়ি চালায় সাবলীলভাবে। পাহাড়ের প্রতিটি বেন্ড মুখস্থ। তবুও রাস্তাঘাটের উন্নতি হলে একটু শান্তি নিয়ে তো বেড়াতে পারবেন পর্যটকরা। বেড়াতে এসে ক্ষণিকের জন্য হলেও দুর্গানাম জপতে কার ভাল লাগে? এবার নিশ্চয়ই সরকার নবগঠিত কালিম্পং জেলার পর্যটন, হোমস্টে টুরিজম, রাস্তাঘাটকে ঢেলে সাজাবেন— এটাই প্রত্যাশা।

হেমকুমার রাইয়ের বাড়ি কোলাখামেই। আমাদের গাইড তথা পাখি চিনিয়ে দেবার সঙ্গী। কোনও চাহিদা নেই। খুশি হয়ে যা দেব তা-ই নিয়েই সন্তুষ্ট। গতকাল বিকেলে আমাদের পরিবার যখন রিসর্টে বিশ্রাম নিচ্ছিল, তখন আমরা বেরিয়েছিলাম শেখরকে নিয়ে। শেখর রাই বাচ্চা ছেলে। স্থানীয় বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। দেখলাম পাহাড়ি পাখিদের নামধাম, চরিত্র ওর নখদর্পণে। আমাদের ছেলেরা ইন্টারনেটে পড়াশোনা করে গিয়েছিল, শেখরের কাছে কোথায় লাগে ইন্টারনেট? তবে বাচ্চা ছেলে, অভিজ্ঞতা কম, তাই বিকেল থেকে সন্ধের সফরে আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়নি। কিন্তু হেমকুমার রাই অত্যন্ত অভিজ্ঞ। আমাদের যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিল, কোন কোন পয়েন্টে পাখি পাওয়া যাবে এবং কেন। দ্বিতীয় দিন সকালে আমাদের নিয়ে গেল নেওড়ার গহন জঙ্গলে, এবং আমাদের উদ্দেশ্য আংশিক সফল করেই ছাড়ল। নিম্নচাপের কারণে প্রকৃতি প্রতিকূল ছিল বলে আমাদের প্রত্যাশা সেইভাবে পূরণ না হলেও যা হয়েছে, সেটাকেও অনেক বড় পাওয়া বলে।

হেমন্ত রাই ৯৮০০৭৮৬৪৭১, যোসেফ ৯৩২০৯৫২৪২

নেপালি রাই সম্প্রদায়ের ৬০-৭০ জন অধিবাসীর বাস এই গ্রামে। প্রকৃতির কোলে শান্ত, সমাহিত এই গ্রামের অন্যতম মূল সম্পদ আন্তরিকতা এবং আতিথেয়তা। মেঘমুক্ত নীলাকাশের নিচে সবুজ এলাচের খেত আর তার মাঝে খণ্ড খণ্ড মেঘের জমাট বেঁধে চলাফেরা। কোথাও কোথাও সবুজ বনের মাঝখানে পেঁজা তুলোর মতো জমে থাকা আর মাঝে মাঝে মেঘ সরে গিয়ে রোদ ঝলমলে সমগ্র উপত্যকা— সব মিলিয়ে অসাধারণ। সাম্প্রতিককালে ইকো টুরিজমের উপর সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে ব্যাপকভাবে। ইতিমধ্যেই এর সুফলও ফলতে শুরু করেছে। ঘরোয়া পরিবেশে নামমাত্র খরচে থাকা, সুস্বাদু খাবার পাওয়া, গরম জল, গিজার, ডাবল কম্বল, রুম হিটার— কী স্বাচ্ছন্দ্য পাইনি ফ্লাইক্যাচার রিসর্টে? হেমকুমার আর তার স্ত্রীর আন্তরিক ব্যবহার একরাতের মধ্যেই আপন করে নিয়েছিল আমাদের। আর অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলাম, হেমকুমারের অতি প্রিয় কুকুরটি এক মিনিটের জন্যেও অতিথিদের পাহারা দেবার দায়িত্ব ভোলেনি। প্রায় ৮ কিমি দীর্ঘ নেওড়ার জঙ্গলে ট্রেকিং-এর সময়ে সামনে একবার দ্রুতগতিতে ধাবমান বুনো শুয়োরকে তাড়া করা ছাড়া তেমন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু অত্যন্ত অদ্ভুতভাবে লক্ষ করলাম, বারবার তাড়ানোর চেষ্টা করা সত্ত্বেও এবং দু’-একবার হেমকুমারের হাতের লাঠির আঘাতে কাতর আর্তনাদ করে পলায়ন করলেও, ক্ষণকাল পরেই আমাদের সঙ্গী হয়ে আমাদের পক্ষী পর্যটনের এবং পর্যবেক্ষণের সঙ্গী হয়েছে।

> শেখর রাই বাচ্চা ছেলে। স্থানীয় বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। দেখলাম পাহাড়ি পাখিদের নামধাম, চরিত্র ওর নখদর্পণে। আমাদের ছেলেরা ইন্টারনেটে পড়াশোনা করে গিয়েছিল, শেখরের কাছে কোথায় লাগে ইন্টারনেট?

২০১৪-র ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয়েছিল কোলাখামের রাস্তাঘাট, বেশ কিছু বাড়িঘর, বিশেষ করে ছাগিয়া ফল্‌স যাবার রাস্তা। বছর সাতেক আগে যখন লাভা, লোলেগাঁও, কোলাখাম গিয়েছিলাম, তখন ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গিয়েছিল সদ্য আবিষ্কৃত ছাগিয়া ফল্‌সে। এখন পথ অত্যন্ত দুর্গম, খাড়াই রাস্তা, পথের দু’ধারে রেলিং ভেঙে পড়ে আছে। সমতলে বসবাসকারী বহু পর্যটককে বলতে শুনলাম, আগে জানলে আসতাম না। পথপার্শ্বস্থ বসার জায়গা বা জলপানের ব্যবস্থা থাকা খুব জরুরি। পথের পাশে আগের মতো রেলিং থাকলে বয়স্ক পর্যটকদের ওঠার সুবিধা হয়। সহস্রধারার মতো রোপওয়ে চালু করা যেতে পারে স্বল্প মূল্যে। জোসেফ, হেমকুমার, শেখরদের মতো গাইডদের জন্য বন বিভাগের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা যেতে পারে। মাত্র একদিনের কোলাখাম সফর ছিল আমাদের। কিন্তু এই সফর আমার চোখের সামনে মেলে ধরল এক অনন্ত সম্ভাবনা। সেটি হল সুন্দর পিচ-ঢালা পথ, পাহাড়ের পাদদেশে আরও সুদৃশ্য হোমস্টে কটেজ, প্রশিক্ষিত গাইড, পর্যটকদের জন্য অনুসন্ধানকেন্দ্র এবং প্রশিক্ষিত গাইড, যারা পর্যটকদের নিয়ে যাচ্ছে নেওড়ার আদিম ভার্জিন অরণ্যে। আমাদের সঙ্গে যাওয়া হেমকুমার রাইয়ের সঙ্গে ছিল কুকরি, হাতে ছিল লাঠি। কিন্তু ওই ঘন অরণ্যপথে হেমকুমার যখন বলল, আর এগনো যাবে না, এ পথে চিতার আনাগোনা আছে, তখন ভয়মিশ্রিত শিরশিরানি একটা অনুভূতি মনে প্রশ্ন তুলে দিয়েছিল, আদিম এই অরণ্যে একটা কুকরি বা হাতের মোটা লাঠি কি চিতা বাঘ বা হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ারের জন্য যথেষ্ট? নাকি পর্যটক, ট্রেকিং-এর দল বা পাখির ছবি তুলতে আসা পর্যটকদের সঙ্গে প্রশিক্ষিত বন্দুকধারী বনকর্মীদেরও থাকা জরুরি, যেখানে নেওড়ার জঙ্গলে সত্যি সত্যি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

গৌতম চক্রবর্তী

ডুয়ার্স থেকে দিল্লি

দেবপ্রসাদ রায়

ইয়ুথ কংগ্রেসের ডেলিগেশন যাবে মস্কোতে। বিমানের টিকিট থেকে সমস্ত আতিথেয়তার ভার রাশিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টির। প্রোগ্রামের মূল আকর্ষণ ছিল ১ মে মস্কোর রেড স্কোয়ারে মে ডে-র প্যারেড দেখা। সেই সফরে সব সময় লেখকের মনে হয়েছিল রাশিয়ানদের মধ্যে একটা সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স কাজ করে। কীভাবে বোঝানো যাবে ভারত কতটা সোভিয়েত নির্ভর, বিভিন্ন আলোচনায় আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেবার একটা চেষ্টা সব সময়েই সুকৌশলে প্রয়োগ করা হত। লেখকও পাল্টা বোঝানোর চেষ্টা করতেন ’৭৭-এর পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গে কম্যুনিস্টদের সন্ত্রাস ও অত্যাচারের শিকার হয়েছেন কংগ্রেসের কর্মীরা।

২৯

কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়াতেন শক্তিপদ মুখোপাধ্যায় স্যার। উনি বলতেন, কোনও পাঁঠা যদি একবার বলির জন্য মায়ের সামনে নিবেদিত হয়ে কোনও কারণে ফিরে আসে, তার আর বলি হয় না, কসাইয়ের দোকানে মাংস হয়ে বিক্রি হওয়ার জন্য চলে যায়। আমিও মনে করতে শুরু করলাম, আমার প্রশিক্ষণ কর্মসূচিরও একই দশা হল। কারণ এক ফাঁকে রাজীবজিকে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উপর একটা পরিকল্পনা দিতে তো পেরেছিলাম, কিন্তু তারপর ওঁর কোনও প্রতিক্রিয়া না পাওয়াতে আর কিছু জিজ্ঞেস করবার সাহস হয়নি।

এই সময়ে আবার বিদেশযাত্রার সুযোগ এল। সোভিয়েত রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির যুব শাখা সিওয়াইও হলেও তার সর্বোচ্চ স্তর ‘কমসোমল’ বলে পরিচিত ছিল। তাই রাশিয়ার ইয়ুথ অর্গানাইজেশন বোঝাতে ‘কমসোমল’ বলাটা অনেক সহজ ছিল। ওরা চাইছিল বিশ্ব যুব উৎসব, যা চার বছর পরপর অনুষ্ঠিত হত, তা ভারতে হোক এবং আমরা সিপিআই-এর যুব শাখা যুব সংঘের সঙ্গে যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানটা পালন করি। কিন্তু আমরা সে প্রস্তাবে রাজি ছিলাম না। আমাদের বক্তব্য ছিল, ভারতে হলে আমরা এককভাবে দায়িত্ব নেব। আর না হলে বাইরে কোথাও হোক।

রাশিয়ানরা এত তাড়াতাড়ি হাল ছাড়তে রাজি ছিল না। তাই ওরা চাইল ইয়ুথ কংগ্রেসের একটা ডেলিগেশন মস্কোতে আসুক। সেখানে বিস্তারিতভাবে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যাবে। বাইরে যাওয়ার সুযোগ। আর এয়ার টিকিট কেটে সমস্ত হসপিটালিটি— সব ওদের। কাজেই যুব উৎসব হোক না হোক, আমন্ত্রণ নিতে তো কোনও বাধা নেই। চারজনের টিম যাবে। আমি, থাঙ্গাবালু, রাজেন্দ্রপ্রসাদ আর অশোক জৈন।

এমনভাবে প্রোগ্রাম করা হল, যাতে আমরা মস্কোর বিখ্যাত ‘মে ডে সেলিব্রেশন’ দেখতে পারি। ৩০ এপ্রিল পৌঁছে গেলাম। ১ মে রেড স্কোয়্যারে মে ডে-র প্যারেড। ওরা বলল, সব মিলিয়ে দশ লক্ষ লোক অংশগ্রহণ করে। মে মাস হলেও মস্কোতে ভালই শীত। আমরা উত্তেজনায় ভুগছি। পৃথিবীর একটা অন্যতম বিখ্যাত ইভেন্ট আমরা দেখতে চলেছি। প্যারেড শুরু হল, জনস্রোত। কোথা থেকে বিভিন্ন পোশাকে এত মানুষ আসছে আর মূল স্কোয়্যার থেকে কোথাও বেরিয়ে যাচ্ছে— বোঝার উপায় নেই। তবে আমরা যত-না আগ্রহ নিয়ে ওদের দেখছিলাম, তার চেয়েও বেশি আগ্রহ নিয়ে ওরা থাঙ্গাবালুকে দেখছিল। ওই শীতে একটা সাদা লুঙ্গি পরে লোকটা কীভাবে দাঁড়িয়ে আছে! একে অপরকে দেখাচ্ছে আর নিজেদের ভিতর কিছু বলাবলি করে ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে। ক’দিন ছিলাম, খেয়াল নেই। তবে লেনিনের শায়িত দেহ দেখেছিলাম লেনিনগ্রাদে। মনে হচ্ছে যেন ঘুমিয়ে আছেন।

আমাদের একদিন নিয়ে যাওয়া হল লাটভিয়ার রাজধানী রিগাতে। লাটভিয়া ১৯৪৩ সালে জার্মানি থেকে অ্যানেক্স করা হয়েছিল। ফলে রাশিয়ার চেয়ে জার্মানিরই প্রভাব বেশি। এখন তো স্বাধীনতা হয়ে গেছে। সবচেয়ে অবাক করেছিল ওখানকার ম্যালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি।

রিগা বিশ্ববিদ্যালয়ে একদিন নিয়ে যাওয়া হল। অধ্যাপকদের সঙ্গে ইন্ডোলজি নিয়ে

আলোচনা। আমি বাইরে গেলে নিজের নামটা ডি পি রে বলতাম। এখানেও তা-ই বলাতে আমার উলটো দিকের অধ্যাপক পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'আপনি ডি পি রে নন। আপনি ডি পি রায়। আপনি বাঙালি।' আমি অবাক বিস্ময়ে বললাম, 'আপনি এত ভাল বাংলা বলছেন কী করে?' উনি বললেন, 'আমি ছ'বছর শান্তিনিকেতনে ছিলাম, আর টেগোরের ন'খানা উপন্যাস রুশ ভাষায় অনুবাদ করেছি। এখানে টেগোর কত পপুলার তা তো ম্যালে টেগোরের এই মূর্তি দেখেই নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন।' আমরা বাংলায় কথা বলছি দেখে রাশিয়ানদের ভ্রুকুঞ্চন শুরু হয়ে গিয়েছিল। এবং আমাদের দোভাষী কাম গাইড জেনিয়া বলে উঠল, 'মিস্টার রায়, উই আর অলরেডি লেট, লেট'স গো।' কী আর করা, উঠতে হল। ভদ্রলোকের নামটাও ভাল করে জানা হল না।

আরও একটা মজার ঘটনা এখানে ঘটল, যখন রিগার কনসোমলের সভানেত্রী তার অফিসে তার পরিচয় দিয়ে নিজের নাম বললেন রুক্মিণী। আমি মজা করে বললাম, তুমি নিশ্চয়ই ভারতীয় নও। ও হেসে বলল, 'না, তবে আমাকে আরও অনেকে বলেছে যে, আমার নামটা নাকি ইন্ডিয়ায় খুব কমন।'

জেনিয়া আমাদের নিয়ে ঘোরে। আর আমার মতোই ধূমপায়ী। কোথাও গিয়ে বলবে, 'মি রে, স্মোকিং ইজ প্রোহিবিটেড হিয়ার।' তার খানিক পরেই একটা সিগারেট ধরিয়ে বলবে, 'সরি, আই অ্যাম ব্রেকিং দ্য রুল।'

একদিন একটা বাচ্চাদের স্কুলে নিয়ে গেল। কো-এড। জেনিয়া বলল, 'আমাদের অতিথিরা ইন্ডিয়া থেকে এসেছে, তোমাদের কিছু জানার থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারো।' একটি বাচ্চা মেয়ে দোভাষীর মাধ্যমে জানতে চাইল ভারতে বুদ্ধিস্ট মানুষ কতজন। আমি যখন বললাম ০.৬ শতাংশ— মেয়েটি যে প্রতিক্রিয়া দিল, তার মানে দাঁড়ায়, হয় তুমি জানো না অথবা তুমি মিথ্যে কথা বলছ। আমি বোঝাতে পারলাম না, সত্যিই এ দেশে জন্মালেও বৌদ্ধধর্ম এ দেশ থেকে বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণে প্রায় বিলুপ্তির পথে। তবে আমাদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন মস্কো ইউনিভার্সিটির ইন্ডোলজির প্রফেসর। তিনি উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ইউকেডি-র উত্থান পর্যন্ত বলতে সক্ষম হলেন। আমি ভাবলাম, আমার দেশে গঙ্গার দক্ষিণ পারের মানুষও উত্তর পার নিয়ে এত গভীরে যেতে পারেনি, যা উনি পেরেছেন।

আমরা চারজন গিয়েছিলাম। কিন্তু লিডার অব দ্য ডেলিগেশন হিসেবে সব জায়গায় আলাপ-আলোচনায় আমাকেই অংশগ্রহণ করতে হত। ফলে বাকি তিনজনের কাছে ট্রিপটা মূলত ভ্রমণকেন্দ্রিক হলেও আমার কাছে ব্যাপারটা অত সহজ ছিল না। আমি সব মিলিয়ে তিনবার রাশিয়া গিয়েছি। আমার সব সময় মনে হয়েছে, ওদের ভিতর একটা সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স কাজ করত। কীভাবে বোঝানো যাবে ভারত কতটা সোভিয়েতনির্ভর— বিভিন্ন আলোচনায়, আকারে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেবার একটা চেষ্টা সব সময়েই সুকৌশলে প্রয়োগ করা হত।

তাই আমাকে রোজ রাতে হোমওয়ার্ক করে প্রত্যুত্তর দেবার জন্য প্রস্তুতি নিতে হত। আর মাঝে মাঝেই বিশ্ব যুব উৎসবে কেন যুব সংঘকে নেওয়া হচ্ছে না তা জানতে চাওয়া হত। ফলে আলোচনা সবসময় সৌহার্দপূর্ণ হত না। কিন্তু আমি 'না' বলবার 'ম্যান্ডেট' নিয়ে গিয়েছি। তাই 'হ্যাঁ' বলার কোনও সুযোগ নেই। আমি পশ্চিমবাংলার ছেলে হওয়ার ফলে রাজ্যে কমিউনিস্টদের অত্যাচার ও আচরণ তুলে ধরে বোঝাবার চেষ্টা করতাম, '৭১-এ রুশ-ভারত মৈত্রী আন্তর্জাতিক আঙিনায় দু'টি দেশকে কাছাকাছি এনে দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে, বিশেষ করে পশ্চিমবাংলায় '৭৭ উত্তরকালগুলিতে যে সন্ত্রাস ও অত্যাচারের শিকার হয়েছে কংগ্রেসের কর্মীরা, তারা কখনও কোনও মঞ্চ থেকে লাল ঝান্ডার সঙ্গে তেরঙা ঝান্ডা উত্তোলিত হলে তা কোনওভাবেই মেনে নেবে না। এক-একসময় মনে হত, ট্রিপটা কাটছাঁট করে ফিরে যাই। কিন্তু সবই তো ওদের হাতে। ফেরার টিকিট বুকিং, হোটেল, অ্যাকোমডেশন। তাই 'পেটে খেলে পিঠে সয়' মানসিকতা নিয়ে টিকে থাকতে হয়েছিল।

আমি তো হোটেলে ঢুকে ঘর নেবার পর রুম সার্ভিসের জন্য কত নম্বর ডায়াল করতে হবে জিজ্ঞেস করে যেন বিরাট অপরাধ করে ফেলেছি। জেনিয়া একটু বক্র হাসি হেসে বলল, 'সরি, এখানে এসব বুর্জোয়া কালচার পাবে না।' রাতের খাওয়া সন্ধে ছ'টায়। সেটাই নাকি ডিনার। আমি দু'দিন পরে বাধ্য হয়ে বললাম, 'ভাই, রাতে আমার ঘরে যা হয় কিছু খাবার দিতে বলো। ছ'টায় খেয়ে আমার রাতে খিদে পায়।'

তবে পেটে খাওয়া যে খুব উপাদেয় ছিল তা-ও নয়। কথায় কথায় 'ভদকা' খাওয়া ওদের অভ্যাস ছিল। শুধু নাটক করে কখনও বলত, 'ফ্রেন্ডস, লেট আস হ্যাভ এ টোস্ট উইশিং দ্য গুড হেল্‌থ অব শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি।' আমাদের অশোক জৈন ছিল শুদ্ধ শাকাহারী। ও বাড়ি থেকে নানারকম শুকনো খাবার নিয়ে গিয়েছিল। নিজের ঘরে লুকিয়ে লুকিয়ে তা-ই খেয়ে পেট ভরাত। আমি আর থাঙ্গাবালু টিটোটলার। তাই সব জায়গায় রাজেন্দ্রপ্রসাদকেই ভদকাপানে ওদের সঙ্গ দিতে হত। থাঙ্গাবালু তো একদিন মরিয়া হয়ে বলে উঠল, 'প্লিজ গিভ মি মাই ন্যাশনাল ড্রিঙ্ক, প্লেন ওয়াটার।' 'প্লেন ওয়াটার? ওকে, আই ক্যান গিভ ইউ ফ্রম ট্যাপ।' তা-ই দাও। মরিয়া থাঙ্গাবালুর জবাব। কারণ মস্কোতে নামার পর থেকে খালি লেমনেড খেতে হচ্ছে। সাদা জলের কোনও দেখা নেই। কত যে অজান্তে গোরুর মাংস খাইয়ে দিয়েছে, তারও ঠিক নেই। মাছ বলে কিছু পাওয়া যাবে না। চিকেন মাঝে মাঝে। ভাতের কোনও দেখা নেই। খালি বন রুটি।

আমি তো হোটেলে ঢুকে ঘর নেবার পর রুম সার্ভিসের জন্য কত নম্বর ডায়াল করতে হবে জিজ্ঞেস করে যেন বিরাট অপরাধ করে ফেলেছি। জেনিয়া একটু বক্র হাসি হেসে বলল, 'সরি, এখানে এসব বুর্জোয়া কালচার পাবে না।' রাতের খাওয়া সন্ধে ছ'টায়। সেটাই নাকি ডিনার। আমি দু'দিন পরে বাধ্য হয়ে বললাম, 'ভাই, রাতে আমার ঘরে যা হয় কিছু খাবার দিতে বলো। ছ'টায় খেয়ে আমার রাতে খিদে পায়।' ও বলল, 'ও, ইউ ওয়ান্ট সাপার? ওকে ওকে।' তারপর থেকে রাতে ঘরে বন রুটি আর মাখন বা চিজ রেখে দিত। তবে যা খেয়ে তার স্বাদ আজও মনে করতে চেষ্টা করি তা হল রাশিয়ার আইসক্রিম। অসাধারণ!

একদিন মস্কোর একটা বড় রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে জেনিয়া বলল, 'জানো, এ রাস্তার সমস্ত বাড়িঘর না ভেঙে আমরা আঠারো ফুট সরিয়ে রাস্তার প্রশস্ততা বাড়িয়েছি।' তখন '৮১ সালে মনে হয়েছিল, তা কখনও হয় নাকি! নিশ্চয়ই গুল মারছে। আজ যখন গয়েরকাটায় এশিয়ান হাইওয়ে তৈরি করতে গিয়ে একটা বাড়িকেও না ভেঙে বাইশ ফুট পিছিয়ে নিয়ে গিয়েছে, তখন বুঝলাম, '৮১ সালের রুশ টেকনোলজি আমার জেলায় আসতে ৩৬ বছর সময় নিয়ে নিল। তারপর আরও দু'বার গিয়েছি। রাশিয়া বদলাচ্ছে, বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু যোলো টুকরো হয়ে যাবে, সেটা বোঝা যায়নি।

(ক্রমশ)

রূপসী ডুয়ার্স

পিগমেনটেশন দূরের উপায়

টিপস্ দিচ্ছেন প্রখ্যাত বিউটিশিয়ান **মালা দাস**

আমরা গয়না, পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে সবরকম ভাবনাচিন্তা করে থাকি। কিন্তু আমরা ত্বকের যত্ন নিয়ে সঠিক চিন্তাভাবনা করি না। যখন যেটা ভাল লাগে বা কেউ বলল, ক্রিমটা ভাল, তখনই সেটা মুখে লাগাতে শুরু করি। চিন্তা করুন ক্রিমটা আপনার ত্বকের উপযুক্ত কি না। কারণ ত্বক এক-একজনের এক-একরকম। এর ফলে ত্বকে নানা ধরনের সমস্যা দেখা যায়। তার মধ্যে একটা সমস্যা Pigmentation, বাংলায় বলে মেচেতা। এই দাগ তুলতে নানারকম ভুল ক্রিম ব্যবহার করে থাকেন। এর ফলে ত্বক লাল হয়ে যায় এবং নানারকম র‍্যাশ হয়। সবার আগে জানতে হবে, আপনার এই দাগটা কেন হয়েছে। এর নানা কারণ— রক্তাল্পতা, মেনোপজ, রাতে ঘুম না-হওয়া, প্রচুর মেকআপ ব্যবহার করা এবং তা ঠিকমতো পরিষ্কার না-করা, থাইরয়েডের সমস্যা, লিভার ঠিক না-থাকা, অন্তঃসত্ত্বাকালীন সমস্যা, খাওয়াদাওয়া ঠিকমতো না করা, মদ্যপান ও ধূমপান করা, সানস্ক্রিন ছাড়া রোদে ঘোরা বা বসা, চুলে নানা ধরনের অ্যামোনিয়াযুক্ত রং করা। তবে অন্তঃসত্ত্বাকালীন সময় যে দাগ হয়, প্রথম থেকে যত্ন করলেই তার থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এর আকৃতি প্রজাপতির মতো হয়। এ ছাড়া মুখে ছোট ছোট তিলের মতো দেখা যায়। এটাকে ফ্রিকেলস বলে। এটা সাধারণত রোদ থেকে হয়। অনেক ক্ষেত্রে ফ্রিকেলস এবং পিগমেন্টেশন জেনেটিক্যাল হয়ে থাকে। তবে এর থেকে মুক্তি পেতে সব সময় ত্বকের যত্ন রাখতে হবে। এর জন্য বিশেষজ্ঞর সাহায্য প্রয়োজন। ব্লিচ করবেন না, এতে পিগমেন্ট বাড়বে, এটা আপনার ওষুধ নয়।

নিয়মিত ফল, শাকসবজি ও প্রচুর জল খান। যোগাসন করুন। সম্ভব হলে সকাল-বিকেল হাঁটুন। নিজেকে সুস্থ রাখতে চেষ্টা করুন। অনেক ক্ষেত্রে ওষুধ থেকেও মুখে মেচেতার দাগ হয়। অনেকে মুখের দাগের জন্য অনুষ্ঠানে যেতে চান না। কিছু সময়ের জন্য মেকআপ আপনাকে সাহায্য করতে পারে। তবে মেকআপ ভাল করে পরিষ্কার করতে ভুলবেন না। পরিষ্কার করে ময়েশ্চারাইজার লাগান এবং নাইট ক্রিম লাগান। সুন্দর করে সাজুন, নিজেকে ভাল রাখুন ও আনন্দে থাকুন।

নিজের রূপ পরিচর্যা বিষয়ে প্রশ্ন পাঠান sahac43@gmail.com এই ইমেলে

AANGONAA
Ladies Beauty Clinic
Shahnaz Herbal • Aroma Therapy
Lotus Professional • Lotus Ultimo
Cheryl's Cosmeceuticals (Hair & Skin)
Loreal Professional
Schwarzkopf Professional
7 Bagha Jatin Road, Siliguri 734001
Satyajit Sarani, Shivmandir
Call : 9434176725, 9434034333

নিশিগঞ্জের হাড়ভাঙার কবিরাজি চিকিৎসার ঐতিহ্যবাহক বেবি ইশোর

কোচবিহার শহর থেকে একটু দূরে নিশিগঞ্জ। এখানেই কোচবিহারের রাজবৈদ্যের বসতবাড়ি। মুসুর বৈদ্যের নাম শোনেনি এমন মানুষ প্রায় পাওয়াই যাবে না এ এলাকায়। রাজার আমলে মুসুর বৈদ্যের কবিরাজি চিকিৎসার গল্প কমবেশি সকলেরই জানা। সেই পরম্পরা আজও ধরে রেখেছেন তাঁর বংশধররা। বেবি ইশোর মুসুর বৈদ্যেরই ছোট ছেলের বউ। বেবির বয়স তখন ষোলোর আশপাশে। তুফানগঞ্জের নাটাবাড়ি থেকে বিয়ে হয়ে এলেন এ বাড়িতে। বিরাট পরিবার। শ্বশুরমশাইয়ের নজর পড়ল বেবির উপর। বুদ্ধিশুদ্ধি, কথাবার্তায় চৌকশ। ঔষধ তৈরির যে ফর্মুলা তা তো বংশের বাইরে বার হতে দেওয়া যাবে না। তাই বউদের এ বিদ্যা শেখানোর নিয়ম ছিল না। তা সত্ত্বেও বেবিকে উপযুক্ত মনে হল শ্বশুরের। ফলে নিজে হাতে ধরে বেবিকে জড়িবুটির ফর্মুলা শিখিয়ে দিলেন। কাজের সময় সঙ্গে নিয়ে হাতেকলমে শিক্ষা দিয়ে স্বাবলম্বী করে দিলেন। এখন নিশিগঞ্জে হাড় জোড়া লাগানোর খুব ভাল কবিরাজি চিকিৎসা হয়, যার প্রধান স্তম্ভটি হলেন বেবি ইশোর। নিশিগঞ্জে নিজের হাসপাতাল তৈরি করেছেন, যেখানে অন্তত কুড়িটা বেড আছে। আসাম, রাজস্থান, বিহার, ওড়িশাসহ বিভিন্ন প্রদেশ থেকে যেমন এখানে চিকিৎসার জন্য রুগিরা আসেন, তেমনি আবার আসেন বাংলাদেশ থেকেও। রুগিদের চিকিৎসা, শুশ্রূষা সব নিজে হাতেই করেন তিনি। তিনিই ডাক্তার, তিনিই নার্স, আবার তিনিই হাসপাতালের মালিকও। এতসব একা হাতে সামলানো তো বটেই, সেই সঙ্গে কোন চিকিৎসায় কী ওষুধ দরকার তা-ও বানাতে হয় ওঁকেই। ধৈর্য, সহিষ্ণুতা আর পরম্পরার ঐতিহ্যের প্রতি সম্ভ্রমবোধ বেবি ইশোরকে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। রুগিদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বুঝতে পারলাম, কত বিশ্বাস থাকলে এঁরা এই হাসপাতালে এসে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এমনকি বছরের পর বছরও পড়ে থাকেন নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে।

শ্বেতা সরখেল

'ডুয়ার্সের ডিশ'। এবার থেকে ডুয়ার্সের রাঁধুনিরা হাজির করবেন রন্ধনশৈলীর নানা এক্সপেরিমেন্ট। সূচনা করলেন **শ্রাবণী চক্রবর্তী**, যাঁর হাতের রান্নায় মমত্ব ও জাদু দুই-ই আছে। আপনিও আপনার উদ্ভাবনী রন্ধনশৈলীর পরিচয় দিতে পারেন আকর্ষণীয় কোনও রেসিপি পাঠিয়ে। মেল করুন 'এখন ডুয়ার্স'-এর ই-মেল আইডি-তে।

কই পাতুরি

উপকরণ

মাঝারি মাপের দেশি কই ৬-৭টা; পোস্ত, নুন ও লংকা বাটা ২ চা চামচ; কালো ও সাদা সরষে অল্প নুন ও লংকা দিয়ে বাটা ২ চা চামচ; পেঁয়াজ ১টা (বাটা); টম্যাটো ১টা (বিচি ফেলে বাটা); টক দই ৪ চা চামচ; সরষের তেল পরিমাণমতো, কালোজিরে ১ চিমটে, কাঁচালংকা কয়েকটি, হলুদ সামান্য।

প্রণালী

কই মাছগুলো নুন দিয়ে খুব ভাল করে ধুয়ে নিন, যাতে ময়লা না থাকে। তারপর নুন-হলুদ দিয়ে মেখে রাখুন কিছুক্ষণ। এর পর সরষের তেলে মাছগুলো হালকা করে ভেজে তুলে নিন। এবার কড়াইতে সরষের তেল দিয়ে প্রথমে কালোজিরে ও কাঁচালংকা দিয়ে দিন। তারপর পেঁয়াজ বাটা, টম্যাটো বাটা, পোস্ত বাটা, সরষে বাটা, ফেটানো টক দই সামান্য হলুদ ও নুন দিয়ে, সঙ্গে হালকা ভাজা মাছগুলো দিয়ে ভাল করে নেড়ে, কড়াইতে চাপা দিয়ে ঢেকে দিন ও গ্যাসের আঁচ কমিয়ে দিন। ৫/৬ মিনিট অপেক্ষা করুন। জল দেবেন না। দেখবেন ওই মশলাতেই মাছ সেদ্ধ হয়ে ঝোলটা বেশ মাখো মাখো হয়ে যাবে। সেই সময় ৪/৫ চামচ কাঁচা সরষের তেল মাছের কড়াইতে দিয়ে, আবার কড়াই চাপা দিয়ে ঢেকে দিন ও গ্যাস বন্ধ করে দিন। কিছুক্ষণ এভাবে রেখে দিন। ঝরঝরে সাদা ভাতে খান, দেখবেন অনেকদিন স্বাদটা মনে থাকবে।

কফি হাউস ? ক্লাবঘর ?
নাকি আরও অনেক কিছু ?

চা-টা। আড্ডা। দাবা-ক্যারম-টেবিল টেনিস। পার্টি। গেট টুগেদার।
সেমিনার। বেড়াতে যাওয়ার বইপত্র ও বুকিং।

সোম-শুক্র বেলা ১টা থেকে রাত ৯টা। শনি-রবি বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা
ফোন - ০৩৫৬১-২২২১১৭
পরিচালনায় NEST SOCIETY (Regn. No. S/2L/5822 of 2013-14)

আড্ডাঘর

মুক্তা ভবনের দোতলায়, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি - ৭৩৫১০১
ফোন - ০৩৫৬১-২২২১১৭

যে কেউ সদস্য হতে পারেন। যে কেউ যোগ দিতে পারেন।
ছ'মাসের এককালীন সদস্য নেওয়া হচ্ছে

সংঘ সংস্কৃতির
ডুয়ার্স

সদিচ্ছা ও যোগ্যতা থাকলেই দর্শক টানা যায়

শীতের শেষকালে এক নাট্যোপভোগী উষ্ণ সন্ধ্যা নিয়ে গত ৩, ৪ এবং ৫ মার্চ জলপাইগুড়ির কলাকুশলী হাজির হয়। ‘সরোজেন্দ্রদেব রায়কত কলাকেন্দ্র’য় শুক্র, শনি ও রবিবার প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছ’টা থেকে অনুষ্ঠিত হয় এই নাট্যোৎসব। মঞ্চ এবং প্রাঙ্গণ— এই দু’মাধ্যমে তারা তাদের নাট্যডালি সাজিয়ে পরিবেশন করে। উদ্‌বোধনের দিন প্রাঙ্গণে বরণ করে নেওয়া হয় জলপাইগুড়ি জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক সূর্য ব্যানার্জিকে। এর পর প্রদীপ প্রজ্বলন ও সমবেত সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। সমবেত সংগীতে অংশ নেয় জলপাইগুড়ি কলাকুশলীর কুশলীবৃন্দ।

তাদের এই নাট্যোৎসবের প্রথম দিনের মঞ্চ নাটকটি ছিল তাদেরই প্রযোজিত নাটক ‘এখন অনেক রাত’। আগে দু’-দু’বার জলপাইগুড়িতে নাটকটি মঞ্চস্থ হলেও নাটকটি দেখার আকর্ষণে এক ফোঁটাও ভাটা পড়েনি। তার কারণ অবশ্যই নাটকটির শিল্পমূল্য। আধুনিক এক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের গহ্বর থেকে উঠে এসে সমাজ, জীবনযাপন ইত্যাদির সংমিশ্রণে এবং সুতীক্ষ্ণ সংলাপ, দক্ষ অভিনয়, চোখ ধাঁধানো আলো এবং মঞ্চসজ্জা ও অবশ্যই আবহসংগীতের মোহময়ী সংমিশ্রণে এক অনবদ্য পরিবেশনা।

দ্বিতীয় সন্ধ্যায় অর্থাৎ ৪ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় প্রাঙ্গণ নাটক ‘ফোড়া’। এর পরই মঞ্চ নাটক ‘ভোকাট্টা’ ছোটদের নিয়ে গড়া এক বড় প্রযোজনা। সম্প্রতি এনএসডি-র জস্‌নে-বচপনে যোগদানকারী এই নাটকটি সত্যিই দুর্দান্ত। আগের সন্ধ্যায় আর্থ-রাজনৈতিক গুরুগম্ভীর নাটক পরিবেশন করার পর এটি যেন সত্যিই এক রিলিফ। হাস্যকৌতুকে ভরা জীবনরসে ও প্রাণোচ্ছলতায় পরিপূর্ণ এই নাটকটি প্রশংসা অর্জন করে নেয় আবারও। আগের দিনের তুলনায় এ দিন দর্শকসংখ্যা বাড়ে অনেকটাই।

শেষ সন্ধ্যায় তারা এক গীতি আলেখ্য ও একাঙ্ক নাটক ‘হিমু’ নিয়ে প্রাঙ্গণকানন ভরিয়ে তোলে। এ দিন ছিল সাম্প্রতিককালে কলাকুশলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা ‘শুক’। মহাভারতে স্বল্প উল্লিখিত ব্যাস-পুত্র শুকের জীবনযন্ত্রণা, জীবন উপলব্ধি, ভীষ্মর দ্বিধাপ্রবণতা, ব্যাসদেবের আত্মসমালোচনা, সমাজ, রাজনীতি, যুদ্ধ, শিক্ষা— সমস্ত কিছুকে নিয়ে এক অভূতপূর্ব প্রযোজনা। রূপকের আলোকে যেখানে উদ্ভাসিত হয় সেই প্রশ্ন যে, ‘রাষ্ট্রের দুর্দিনে, রাষ্ট্রের সংকটে ঠিক কী হওয়া উচিত শিক্ষকদের ভূমিকা?’ মহাভারতকে আশ্রয় করে আধুনিক সমাজও প্রতিফলিত হয় এই নাটকের মুকুরে। নাটক দেখে স্তব্ধ হয়ে ওঠেন দর্শক। সব কৃতিত্বই পরিচালক এবং অভিনেতাদের।

এই নাট্যোৎসবে আলোক প্রক্ষেপণে ছিলেন প্রবীণ আশিস দে এবং শব্দ প্রক্ষেপণে ছিল ‘গীতমালা’। রূপসজ্জার দায়িত্ব সামলেছেন সন্দীপ ব্যানার্জি এবং অঙ্কুর বিশ্বাস। তিনটি নাটকই পরিচালনা করেছেন তমোজিৎ রায়। মঞ্চসজ্জায় ছিলেন অভিজিৎ বসু, বিবেক বাসুনিয়া এবং কলাকুশলীবৃন্দ। বর্তমানে ‘এক্সচেঞ্জ’ নাট্যোৎসবের সময়ে দাঁড়িয়ে যখন অন্য সব নাট্যদল উৎসব করার আগে বাইরের দলকে আনার চিন্তায় অধীর হয়ে ওঠে, তখন কলাকুশলী দেখিয়ে দিল যে, সদিচ্ছা এবং যোগ্যতা থাকলে শুধুমাত্র নিজেদের প্রযোজনা দিয়েই দর্শক টেনে নেওয়া যায়। সত্যি, স্যালুট কলাকুশলী। সার্থক তোমাদের নাট্যবিশ্বাস, নাট্যচর্চা। তোমরাই বলতে পারো—

‘সত্যের প্রকাশে জীবনের বিকাশে
চেতনার নেই কোনও অন্ত
নাটক তো হাতিয়ার নির্ভীক প্রতিবাদ
মঞ্চ মায়ায় জীবন্ত।’
(‘আধার’, কুমারেশ দেব)

গ্রন্থন সেনগুপ্ত

উত্তরবঙ্গ নাট্যোৎসব

জলপাইগুড়ি রূপায়ণ নাট্যসংস্থার ব্যবস্থাপনায় কেটে গেল আবিষ্ট তিনটে সন্ধ্যা। উপলক্ষ ‘উত্তরবঙ্গ নাট্যোৎসব’, সরোজেন্দ্র দেব রায়কত প্রেক্ষাগৃহ, ১৭ থেকে ১৯ মার্চ। সামগ্রিকভাবে আটটি নাট্যসংস্থাই বিভিন্নভাবে বিভিন্ন আঙ্গিকে বলে গিয়েছে মানুষ আর তার মানবিক মুখের বৃত্তান্ত। কাঙ্ক্ষিত স্পর্ধা আর নিষ্ঠায় প্রত্যেকেই প্রতিস্থাপিত করেছে ভালবাসার চিহ্ন। সে ভালবাসা মানুষের প্রতি মানুষের আর উৎপাটিত শিকড় বা ছিন্নমূল মানুষের কান্নার অনুভূতিগুলোকে অনুভবের মধ্যে নিয়ে আসার আকুল আকুতি। আর যেন বলতে চাইল টপাটপ টপ হয়ে যাওয়ার ইঁদুর দৌড়, মূল্যবোধহীন আধুনিকতা আর মুখোশের গল্প।

প্রথমেই সব্যসাচী দত্ত (নির্দেশক, সৃষ্টি মাইম থিয়েটার)-র কথা উল্লেখ না করে পারছি না। ‘কাকতাড়ুয়া’ একটি মাইম পরিবেশনা। পরিচিত অক্ষরবিহীন অথচ প্রত্যাশার বৃষ্টি যখন আসে আর সেই ধারায় কীভাবে ভেজা হয়ে ওঠে আনন্দ। আহা, অঙ্গের আঙ্গিক আর শরীরী ভাষা কীভাবে বিষয়কে ধ্বনিময় করে প্রাণের ছবি করে তোলে। তখন ছবিটা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কথা, ‘কেউ উদ্‌বাস্তু হয় ভিটেমাটি ছেড়ে, কেউ উদ্‌বাস্তু হয় আদর্শছাড়া হয়ে।’

এ ছাড়া কোচবিহার বর্ণনার পরিবেশন ‘এই করেছ ভাল’, কোচবিহার ব্রাত্যসেনার পরিবেশন ‘দুধ মা’, শিলিগুড়ি ইঙ্গিত-এর পরিবেশন ‘আপনজন’, আলিপুরদুয়ার সংঘশ্রীর পরিবেশন ‘সাকিন’, মালবাজার অ্যাক্টোওয়ালার পরিবেশন ‘বৃদ্ধাশ্রম’। আলাদা আলাদা করে প্রতিটি নাটক সমাজের বিভিন্ন দিককে চিহ্নিত করে গেল। ‘পার্থিব জীবনটা যে সীমাবদ্ধ, তাই হিসেব বুঝে তার ভাগবাটোয়ারা করতে হয়। আমাদের শ্রেণির লোকের ’পরে ভগবান দুঃসহ দায়িত্ব চাপিয়েছেন, সেটা বহন করতে গেলে আমাদের ভাগে প্রাণের সারাংশ অনেকটা বেশি পরিমাণে পড়া চাই। ওদের খুব কম বাঁচলেও চলে, কেননা ওদের ভার লাঘবের জন্যে আমরাই বাঁচি। এ কি ওদের পক্ষে কম বাঁচোয়া?’ উত্তরবঙ্গ যথেষ্ট সাবালক হয়ে উঠেছে ভাষায়, শালীনতায়, মঞ্চসজ্জায়, আলো ও শব্দ ব্যবহারে। এঁদের প্রোডাকশন না দেখলে তা বোঝা যাবে না।

নিজস্ব প্রতিনিধি

শতবর্ষে শিলিগুড়ির
বয়েজ হাই স্কুল

স্কুলের সামনে রয়েছে একটি ফুলের বাগান। তাতে অনেক ফুল শোভা পাচ্ছে। তার মধ্যে রয়েছে নানারকম গাঁদা ফুল। স্কুলের জমি দু’-একরের থেকে সামান্য কিছু বেশি। সেই তুলনায় স্কুলের একপাশে সে ফুলের বাগান অতি সামান্যই। তার মধ্যেই স্কুলের পরিচালন কর্তৃপক্ষ আর-একটি ফুলের বাগান করতে চাইছেন। এই ফুলের সঙ্গে অন্য অনেক ফুলও কিন্তু প্রতি বছর উপহার দিয়ে যাচ্ছেন স্কুলের শিক্ষকরা। স্কুলের শতবর্ষ পার হচ্ছে। এই শতবর্ষের স্কুলটি দেশ তো বটেই, গোটা সভ্যতাকে বলা চলে অনেক ফুল, মানে অনেক কৃতী সন্তান উপহার দিয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শুরু করে ইউরোপসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এই স্কুলের কৃতী সন্তানরা ছড়িয়ে পড়েছেন। উদাহরণ বহু রয়েছে। কলকাতা হাই কোর্টের প্রয়াত প্রধান বিচারপতি আনন্দময় ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে বর্তমান ভারতীয় ক্রিকেট দলের তারকা ঋদ্ধিমান সাহা, টেবিল টেনিসে ‘অর্জুন’ পাওয়া শুভজিৎ সাহা ও সৌম্যজিৎ ঘোষ, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ডঃ অশ্রুকুমার শিকদার, প্রয়াত নকশাল নেতা চারু মজুমদার, প্রয়াত লোকনাথ চট্টোপাধ্যায় তথা লকু ডাক্তার, প্রয়াত ক্ষীরোদনাথ চট্টোপাধ্যায় ওরফে কালু ডাক্তার, প্রয়াত নানু মিত্র ছাড়াও রাজ্যের বর্তমান পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব, শিলিগুড়ির মেয়র তথা বিধায়ক অশোকনারায়ণ ভট্টাচার্য-সহ আরও অনেকে শিলিগুড়ির শতবর্ষ পেরনো বয়েজ হাই স্কুলের ছাত্র। স্কুলের শিক্ষকদের কথায়, ফুলের মতো কৃতী সন্তানদের উদাহরণ বলে শেষ করা যাবে না।

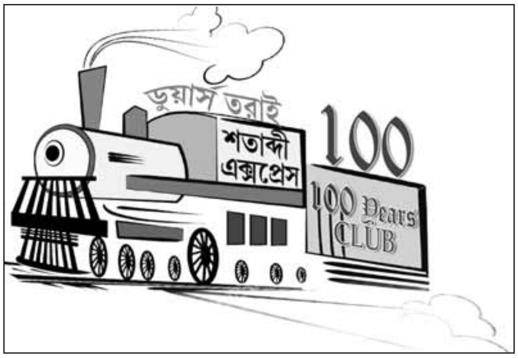

শিলিগুড়ি তো বটেই, উত্তরবঙ্গে, এমনকি গোটা রাজ্যেই এখন নামকরা স্কুল হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে শিলিগুড়ি বয়েজ হাই স্কুল। সে স্কুলেই এবারে শতবর্ষ পালনের উৎসব শুরু হয়েছে। চলতি বছরের ২ জানুয়ারি স্কুলটি শতবর্ষে পদার্পণ করায় তার উৎসব পালনের প্রথম প্রক্রিয়া শুরু হয়। ২৭ জানুয়ারি বেরিয়েছিল শোভাযাত্রা। এবারে এপ্রিল মাস থেকে ধাপে ধাপে আন্তঃস্কুল দৌড় প্রতিযোগিতা ছাড়াও টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। তারপর রক্তদান শিবির হবে। শিক্ষামূলক অনেক বক্তৃতা অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে। ডিসেম্বর মাসের ৩১ তারিখে এই শতবর্ষ পালনের অনুষ্ঠান শেষ হবে। অনুষ্ঠান শেষ করার আগে তিন দিন ধরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। চেষ্টা হচ্ছে কলকাতা থেকে শিল্পীদের নিয়ে আসার। স্থানীয় শিল্পীদেরও প্রাধান্য দেওয়া হবে। স্কুল পরিচালন কমিটি তথা শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির সভাপতি মধুসূদন চক্রবর্তী ও প্রধান শিক্ষক চন্দন দাস জানাচ্ছেন, স্কুলের গর্ব

SILIGURI BOYS HIGH SCHOOL
ESTD-1918
100

চন্দন দাস, বর্তমান প্রধান শিক্ষক

তথা ভারতীয় ক্রিকেট দলের তারকা ঋদ্ধিমান সাহার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা হচ্ছে। তাঁরা আশা করছেন, উৎসব পালনের সময় যে কোনও দিন তিনি স্কুলে আসতে পারেন। ঋদ্ধিমান স্কুলের শিক্ষকদের প্রতি প্রণাম জানিয়ে তাঁর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

শতবর্ষ পালনে শিলিগুড়ি বয়েজ হাই স্কুল এই কারণেই বহু শিক্ষাপ্রেমী মানুষের কাছে গুরুত্বের বিষয় যে, প্রতি বছর এই স্কুল মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে তাদের সাফল্য বজায় রাখছে। গোটা রাজ্যে সেরা দশের মধ্যে প্রায়ই নিজেদের নাম মেধাতালিকায় জ্বলজ্বল করে তুলে দিচ্ছে এই স্কুলের ছাত্ররা। ২০১৪ সালে মাধ্যমিকে দীপমাল্য রায় গোটা রাজ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করে স্কুলের ধারাবাহিক সাফল্যের স্কোরবোর্ডকে সচল রাখে। তার আগে উচ্চমাধ্যমিকে সঞ্জয়কুমার রায় মেধাতালিকায় স্কুলের সুনাম উঁচুতে মেলে ধরে। হিসেব বলছে, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে প্রতি বছর এই স্কুল থেকে গড়ে তিনশোজন করে পরীক্ষায় বসছে। এর মধ্যে মাধ্যমিকে পাশের হার গড়ে ৯৮ শতাংশ। স্টার মার্কস অর্থাৎ গড়ে ৭৫ শতাংশের বেশি নম্বর এই স্কুল থেকে পায় ৪৫ শতাংশের উপর ছাত্র। রাজ্যের মেধাতালিকায় প্রায় প্রতি বছর ঠাঁই করে নেওয়া স্কুলে কিন্তু সমস্যা অনেক রয়েছে। সুন্দর সুন্দর সব ফুল স্কুলের শিক্ষকরা উপহার দিলেও তাঁদের অনেক সমস্যা। স্কুলে এখন ছাত্রসংখ্যা ২৪০০-র কিছু বেশি। অথচ শিক্ষক মাত্র ৪৭ জন। সরকারের যেখানে অনুমোদন রয়েছে ৬১ জন শিক্ষকের, সেখানে পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাবে স্কুলটি বলা চলে ধুঁকছে। ফলে স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র বা আংশিক সময়ের শিক্ষকদের দিয়ে কোনওমতে কাজ চালানো হচ্ছে। শিক্ষকের অভাবে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়ানোই হচ্ছে না এখন। কম্পিউটার সায়েন্স বা স্ট্যাটিস্টিক্সে কোনও শিক্ষকই নেই এখন। ফলে সেইসব বিষয়ে পঠনপাঠনে সমস্যা তৈরি হয়েছে। আবার অঙ্ক ও পদার্থবিজ্ঞানেও পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই।

অনেক শিক্ষক অবসর নিয়েছেন। তাঁদের স্থানে নতুন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি। অথচ স্কুলে ছাত্র অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগের চাপ বেড়েছে। পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত চারটে করে বিভাগ। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে তিনটি করে বিভাগ—বিজ্ঞান, কলা ও বাণিজ্য। অথচ স্কুল যখন শুরু হয়, সেই ১৯১৮ সালের ২ জানুয়ারি শিক্ষকসংখ্যা ছিল মাত্র ৬ জন। তখন শিলিগুড়ি অবশ্য একটি গ্রাম। তখন সেই স্কুলে ছাত্রসংখ্যার প্রকৃত হিসাব এখন সেভাবে কেউ দিতে না পারলেও, বর্তমান

শতবর্ষ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার ইচ্ছে আছে: ঋদ্ধিমান

আমার সব সময় বলতে ভাল লাগে, আমি শিলিগুড়ি বয়েজ হাই স্কুলের ছাত্র। আমি খেলাধুলো জগতের লোক। আজ ভারতীয় দলে রয়েছি। কিন্তু এটাও তো ঠিক, স্কুলের এবং শিক্ষকদের সাহায্য না পেলে এত দূর আসতে পারতাম না। সবচেয়ে বড় কথা, বয়েজ হাই স্কুল আমাকে ভাল মানুষ হতে শিখিয়েছে। সময় পেলে স্কুলের শতবর্ষ পালন অনুষ্ঠানে যাওয়ার ইচ্ছে রয়েছে।

ঋদ্ধিমান সাহা, ক্রিকেটার

এক গর্বিত বয়েজিয়ান

দেশে বা বিদেশে স্কুল নিয়ে যে কোনও আলোচনাই হোক না কেন, আমি নিজেকে শিলিগুড়ি বয়েজ হাই স্কুলের ছাত্র বলতে গর্ব বোধ করি। '৯১ সালে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর স্কুল থেকে বেরনোর সময় মনে হয়েছিল, যদি কলেজের পড়াটাও এই স্কুলেই করতে পারতাম, তাহলে কী ভালই না হত! '৯৪ সালে কাজের সূত্রে কলকাতা চলে আসতে হয়েছে। কিন্তু এখনও শিলিগুড়ি গেলে একবার স্কুলের সামনে না গেলে মনটা বলে, কী যেন মিস করলাম! এখন তো আমাদের সময়কার স্যারেরাও আর নেই। সেই সময়কার পরিবেশ বা পরিস্থিতিও পালটে গিয়েছে। তবে এসবের মধ্যেও উপভোগ করেছিলাম ২০১৩ সালের অক্টোবর মাসের সেই দিনটা, যে দিন আমাদের '৮৯ সালের মাধ্যমিক ব্যাচের ছাত্ররা স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষকদের সম্মান জানানোর জন্য একটা অনুষ্ঠান করেছিলাম। ওই একটা দিন দেখেছিলাম আমরা, স্যারেরা সবাই একটা সময় কেঁদে ফেলেছিলেন।

স্কুল নিয়ে স্মৃতি বলতে শুরু করলে শেষ হবে না একটা লেখায়। তবে আমি দেখেছি, স্যারেরা মূলত দু'ধরনের পুরনো ছাত্রদের মনে রাখেন। ভাল রেজাল্ট করা ছাত্রদের এবং আমার মতো অবাধ্য পড়ুয়াদের। বেশ মনে আছে, একবার আমি একটা অন্যায় না করা সত্ত্বেও এক স্যারের মোটা লাঠি সরাসরি নেমে এসেছিল আমার পিঠে। তার প্রতিবাদে গোটা স্কুল ক্লাস বয়কট করেছিল। আমিও চাই না, আজ সেরকম কিছু হোক। কারণ, হাজার ভাল স্মৃতির মধ্যে ওই একটা দিনের কথা ভাবলে আমার আজও কষ্ট হয়। দুঃখ পাই, যখন দেখি, স্কুলের একশো বছর পালন নিয়েও রাজনীতিকরা শিলিগুড়ি বয়েজকেই বেছে নিয়েছেন তাঁদের উদ্দেশ্যসাধন করতে। আজকের ছাত্ররা ভাল থাকুন। আগামী একশো বছরে স্কুলের নাম আরও উজ্জ্বল করুন তাঁরা।

চিত্রদীপ চক্রবর্তী, সাংবাদিক

স্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতি (সেই স্কুলেরই অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক) মধুসূদন চক্রবর্তীর মতে, আনুমানিক শ'দুয়েক ছাত্র নিয়ে স্কুলটির যাত্রা শুরু করেছিল। ১৯২০ সালের জানুয়ারি মাসেই স্কুলটি অনুমোদনপ্রাপ্ত হয়। তখন স্কুলে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা হত।

স্কুলেরই একজন প্রাক্তন ছাত্র ও প্রাক্তন শিক্ষক হলেন গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। গোটা রাজ্যে ভ্রমণ লেখক হিসাবে বেশ সুখ্যাতি রয়েছে গৌরীশংকরবাবুর। তিনি ওই স্কুলে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়াতেন। ১৯৫৬ সালে গৌরীশংকরবাবু এই স্কুলে ছাত্র হিসেবে যোগ দেন। তিনি সেখানে পঞ্চম শ্রেণিতে ভরতি হয়েছিলেন। ১৯৬৩ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে তিনি বার হন ওই স্কুল থেকে। পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে আবার তিনি ওই স্কুলে আসেন। তবে ছাত্র হিসেবে নয়, সহশিক্ষক হিসেবে। ২০০৫ সালে শিক্ষকতার চাকরি থেকে ওই স্কুলেই অবসরগ্রহণ করেন গৌরীশংকরবাবু। তাঁর বাবা প্রয়াত জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য ছিলেন শিলিগুড়ির প্রাক্তন বিধায়ক, তিনি শিলিগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যানও ছিলেন। পুরনো স্মৃতিচারণায় গৌরীশংকরবাবু বলছিলেন, 'আমার বাবা আমাকে হাতে ধরে ওই স্কুলে নিয়ে গিয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে ভরতি করেন। আমার ফাইভ-এ ক্লাসটি ছিল কাঠের দোতলার নীচতলায়। এখন তো সেখানে স্কুলের পাকা ভবন তৈরি হয়ে গিয়েছে। তখন ছিল টিনের ছাউনি। বিদ্যুৎ ছিল না। দু'খানা টানা পাখা ছিল। ১৯৬২-৬৩ সাল নাগাদ স্কুলের পাকা ভবন তৈরির কাজ শুরু হয়। আমাদের সময় অমূল্যভূষণ চৌধুরি নামে এক শিক্ষকমহাশয় ছিলেন। তিনি ইংরেজি, অঙ্ক দুটোই পড়াতেন। অত্যন্ত রাশভারী ও গম্ভীর ছিলেন। তিনি বলতেন, স্পেয়ার দ্য রড অ্যান্ড স্পয়েল দ্য চাইল্ড।'

গৌরীশংকরবাবু স্কুলের স্মৃতিচারণায় আরও বলেছিলেন, 'তখন ক্লাস চলার সময় ছাত্ররা অমনোযোগী হলে শিক্ষকরা বেধড়ক পেটাতেন। চুলের মুঠি ধরে বুমবাম পেটানো হত। মার দেখে ছাত্রের অভিভাবকরা এসে বলতেন, দেখবেন স্যার, ছেলেটার প্রাণটা যেন বেঁচে থাকে! এখন কোনও ছাত্রকে সামান্য মারলেই সেই ছাত্রের পরিবারের লোকেরা এসে বিচার চাইতে থাকেন। কিন্তু তখন এরকম ছিল না। তখন শিক্ষকরা যে ছাত্রকে আজ শাসন করে গেলেন, পরদিন তারই জন্য চকোলেট নিয়ে আসতেন। তখন এরকম বাণিজ্যিক পড়াশোনা বা টিউশন ছিল না। ছাত্র ও শিক্ষক ছিল একটা মধুর সম্পর্ক। তখন শিক্ষকদের জীবনযাত্রার মানও ছিল অনাড়ম্বর। হাই থিঙ্কিং, সিম্পল লিভিং-এর মধ্যে দিয়ে তাঁরা সময় পার করতেন। শতকরা ৯৯ ভাগ শিক্ষক ধুতি-পাঞ্জাবি পরে স্কুলে আসতেন। আর অধিকাংশ শিক্ষক স্কুলে আসতেন পায়ে হেঁটে। আমাদের ছাত্রজীবনে এই স্কুলে শিক্ষক হিসাবে ছিলেন শচীন্দ্রমোহন সরকার। একেবারে দেবতুল্য লোক। ইংরেজি পড়াতেন, আদর্শ শিক্ষক। খদ্দরের মোটা পাজামা-পাঞ্জাবি পরতেন। আর-একজন শিক্ষক ছিলেন বিধুবাবু। সন্ধে হলেই হ্যারিকেন নিয়ে এলাকায় বেরিয়ে পড়তেন। কোনও বাড়ি থেকে ছাত্রদের পড়ার আওয়াজ না শুনতে পেলেই অভিভাবকদের বলতেন, কী ব্যাপার, বাড়িতে পড়াশোনার আওয়াজ কোথায়? আর বৃষ্টি হলেই স্কুলে যেতাম। মা বলত, আজ বৃষ্টি, স্কুলে যাস না। কিন্তু বৃষ্টির সময় স্কুলে যেতে ভাল লাগত। আর গিয়ে দেখতাম, ক্লাসরুমে গোরুর প্রস্রাব আর গোবর। মাস্টারমশাই তখন ছুটি দিয়ে দিতেন। একবার খুব দুষ্টুমি করার শখ হল। স্কুলের ঘণ্টা ছুটির আগে বাজিয়ে দিয়েই

উপরে বাঁ দিক থেকে পরপর, ছেলেদের মার্চ পাস্ট, স্কুলের বিভিন্ন পদকের সংগ্রহ, বর্তমানের কিছু শিক্ষক, প্রাক্তন শিক্ষক গৌরীশংকর ভট্টাচার্য

হাওয়া ! অসময়ে ঘণ্টার শব্দ শুনে সব ছাত্র ছুটির ঘণ্টা ভেবে ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে আসে। স্কুলের পুরনো ঐতিহ্যমণ্ডিত বহু কিছু হারিয়ে গেলেও শতবর্ষ পুরনো ঘণ্টাটা কিন্তু এখনও রয়ে গিয়েছে।’

স্কুলের শিক্ষকতার জীবন স্মরণ করতে গিয়ে গৌরীশংকরবাবু বলতে থাকেন, ‘তখন সাতের দশক। স্কুলে যোগ দিয়েই বোমাবাজির আওয়াজ কানে আসে। তখন নকশাল আন্দোলন তুঙ্গে। ফলে প্রায়ই স্কুলে বোমা পড়ত। এখনকার মায়েদের মতো তখন মায়েরা স্কুলের সামনে এসে ভিড় করে গোল হয়ে বসে থাকতেন না। তখন ছেলেদের স্কুলে মহিলা শিক্ষক ছিলেন না। এখন আছেন। তখন এরকম কম্পিউটার বা নেট আসেনি।’

রাজ্যের বর্তমান পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব এই স্কুল থেকে পড়াশোনা করেছেন। তিনি স্কুলের শতবর্ষ পালনের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। গৌতমবাবু তাঁর প্রয়াত দাদা বিচারপতি অনুপ দেবের নামে স্কুলের উন্নয়নে পাঁচ লক্ষ টাকা সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন।

স্কুলের বর্তমান পরিচালন সমিতির সভাপতি তথা শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির সভাপতি মধুসূদন চক্রবর্তী ১৯৬১ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত স্কুলের অর্থনীতির শিক্ষক ছিলেন। ২০০৯ সাল থেকে মধুসূদনবাবু স্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতি। তিনি জানালেন, স্কুলের প্রাথমিক বিভাগ আলাদা হয়ে গিয়েছে। স্কুলে একটি সাইকেল স্ট্যান্ড হয়েছে। তিনতলা বিল্ডিং হয়েছে সর্বশিক্ষা মিশনের টাকায়। ছেলেরা যাতে স্কুল থেকে পালাতে না পারে, সে জন্য চারদিক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। চলছে মিডডে মিল। স্কুলের শৃঙ্খলা চাঙ্গা করা হয়েছে। স্কুলের আরও উন্নতির চেষ্টা হচ্ছে। ভূমিকম্পে কিছুদিন আগে পুরনো কিছু ক্লাসঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেসব মেরামতে তাঁরা নজর দিচ্ছেন। সরকারি বা অন্য সাহায্য পেলেই তাঁরা সেইসব ক্লাসঘর মেরামতের চেষ্টা করবেন। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে ইংরেজি মাধ্যম চালু করার কথা ভাবা হচ্ছে। স্কুলের সব শিক্ষকের নিরলস প্রয়াসের জেরেই স্কুলের এই উন্নতি। তিনি আরও বলেন, গত ২৭ জানুয়ারি স্কুলের শতবর্ষ পালনের শোভাযাত্রায় চার হাজারের মতো প্রাক্তন ছাত্র যোগ দেয়। তবে স্কুলের শতবর্ষ পালনের উৎসবে এখনও পর্যন্ত মাত্র দু’হাজার প্রাক্তনী নাম লিখিয়েছেন, যা আশানুরূপ নয়। অথচ বিভিন্নভাবে স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব এই স্কুল থেকে পড়াশোনা করেছেন। তিনি স্কুলের শতবর্ষ পালনের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি স্কুলের উন্নতিতে সবরকম সহায়তার আশ্বাসও দিয়েছেন। গৌতমবাবু তাঁর প্রয়াত দাদা বিচারপতি অনুপ দেবের নামে স্কুলের উন্নয়নে পাঁচ লক্ষ টাকা সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। গৌতমবাবুর সাহায্য পেলে স্কুলের অনেক ভাঙা ক্লাসঘর মেরামতে হাত দেওয়া হবে বলে স্কুল কর্তৃপক্ষ ভেবে রেখেছেন। আবার বিধায়ক তথা মেয়র অশোক ভট্টাচার্যও ওই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। সেই হিসাবে অশোকবাবুও তাঁর বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য স্কুলকে প্রদানের প্রয়াস নেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

স্কুলের বর্তমান প্রধান শিক্ষক চন্দনবাবু ১৯৯৯ সালের ২৬ নভেম্বর প্রধান শিক্ষক হিসাবেই কাজে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি জানিয়েছেন, তিনি স্কুলে যোগ দেওয়ার পর নতুন অনেক বিল্ডিং হয়েছে। ল্যাবরেটরিগুলোতে পরিবর্তন এসেছে। ছোট ল্যাবগুলো বড় করা হয়েছে। ম্যাথ ল্যাব তৈরি হয়েছে। তিনি আসার পরই পঠনপাঠনে স্ট্যাটিস্টিক্স, কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন, হেল্‌থ অ্যান্ড ফিজিক্যাল এডুকেশন চালু হয়েছে। গত বছর থেকে স্কুলে চালু হয়েছে বৃত্তিমূলক পাঠক্রম। প্রথমে দু’টি বিষয়ে— হেল্‌থ কেয়ার ও আইটিইএসে পাঠ্যক্রম চালু হয়। গত বছর নবম শ্রেণিকে নিয়ে চালু হয়ে এবারে দশম ও একাদশ যুক্ত হয়েছে। তাঁরা স্কুলে আরও শ্রেণিকক্ষের পাশাপাশি স্মার্ট ক্লাস চাইছেন। তবে প্রধান শিক্ষকের আক্ষেপ, বহু পুরনো ছাত্র স্কুলের শতবর্ষ পালনের উৎসবে নিজেদের যুক্ত করছেন না। হয়ত সকলে ব্যস্ত। স্কুলের শতবর্ষ পালনের জন্য ৪৭ জনের কার্যকরী কমিটি তৈরি হয়েছে। প্ল্যাটিনাম জুবিলিতেও দেখা গিয়েছিল, মাত্র ৪৫৬ জন প্রাক্তনী উৎসব পালনে যোগ দিয়েছিলেন।

তবে স্কুলের সামনে রাস্তার ধারে রোজকার যানজট অভিভাবকদের চিন্তা বাড়িয়ে দিয়েছে। স্কুলের সামনে রাস্তার উপর পার্কিং-এর জেরে এক বিশ্রী অবস্থা তৈরি হচ্ছে।

বাপি ঘোষ

ছবি: প্রতিবেদক

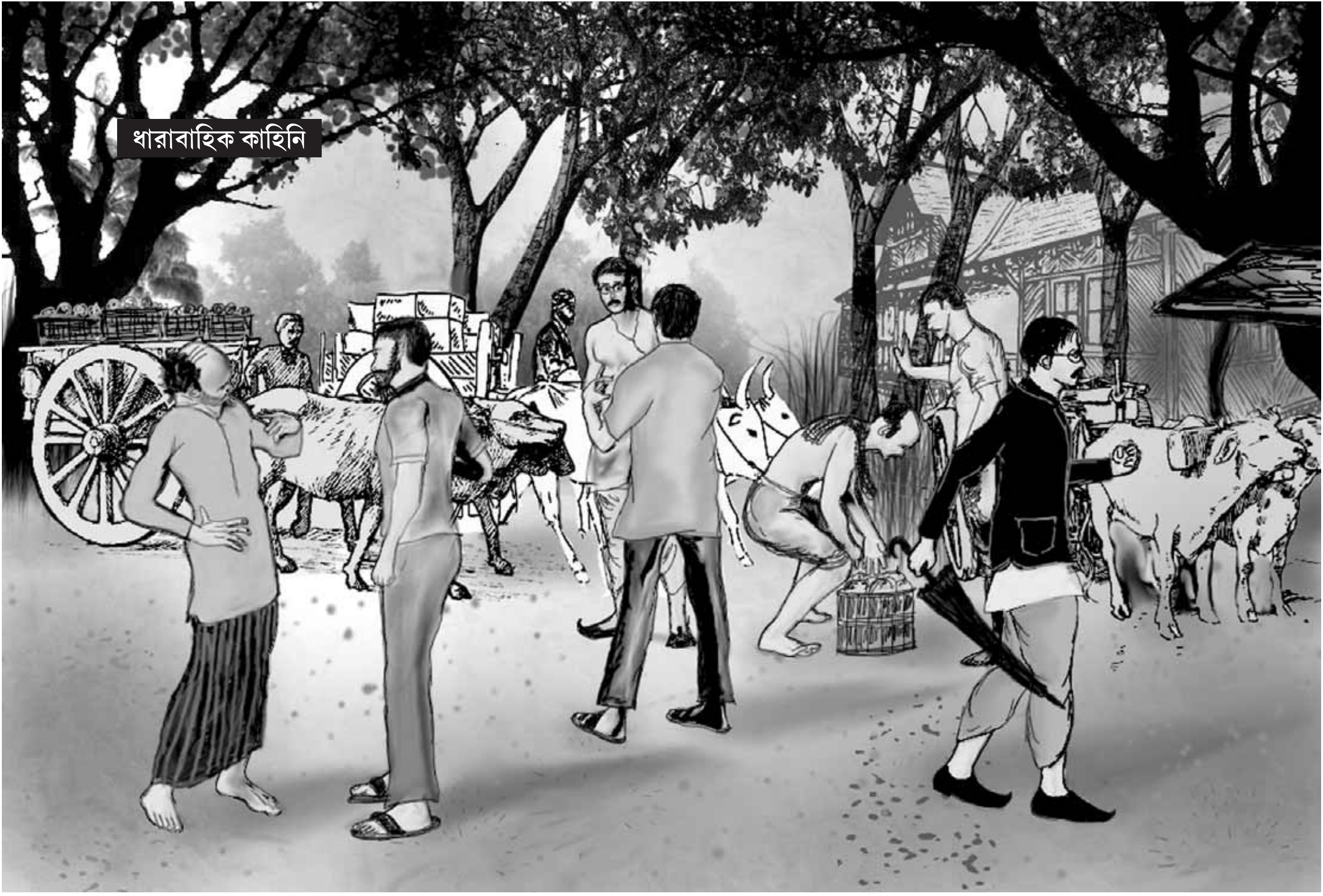

উত্তরাই তরাই

খুদিদা কদমতলার লাগোয়া চিটাগাং বিস্কুট ফ্যাক্টরির দোকান থেকে দু'ডজন তক্তা বিস্কুট কিনলেন। প্রায় ফুলস্ক্যাপ কাগজের সাইজের বিস্কুট এক-একখানা! এই বিস্কুটগুলো শোভা শিশুর মতো আনন্দে খায়। আজকেই তার বার্তা পাঠিয়ে বেয়াই রাজীবলোচন নিশ্চিত করেছেন যে, আগামীকাল জলপাইগুড়ি পৌঁছাচ্ছে শোভা আর গগনেন্দ্র। এর পর থেকেই খুদিদা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আদালতের কাজ কোনওমতে সামাল দিয়ে একজন ঝাঁকামুটে জোগাড় করে বেরিয়ে পড়েছেন কেনাকাটা করতে। বেলা তিনটে বেজে গিয়েছে। ভেজা ভেজা বাতাস বইছে টাউন জুড়ে। মেঘের আড়ালে মাঝে মাঝেই হারিয়ে যাচ্ছে রোদ্দুর। শ্রাবণ একটু শান্ত হয়েছে দু'দিন হল। তা-ই দেখেই আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওরা।

দক্ষিণে তেঁতুলিয়া রোড ধরে আসা সারি সারি গোরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। অধিকাংশ গাড়ি আম বোঝাই। পাঁচ টাকা গাড়ি যাচ্ছে সূর্যাপুরি আমের। তবে গাড়ি বোঝাই আম খাওয়ার লোক নেই। শেয়ারে কাউকে যদি পাওয়া যায়, সেই আশায় খুদিদা অপেক্ষা করতে লাগলেন। রাখালদেবী থেকে জোত পরিদর্শন করে নুরুল হোসেন তাঁর বিখ্যাত গোরুর গাড়িতে আধশোয়া অবস্থায় গড়গড়া টানতে টানতে ফিরছিলেন সেই সময়। দেখার মতো দৃশ্য। দুটো দশাসই চেহারার বলদে টানা গাড়ি। গাড়ির উপরে চামড়ার গদি-আঁটা বিছানা। তিনি মাঝে মাঝেই জোত পরিদর্শনে বার হন। প্রতিবারই লোকে কাজ থামিয়ে তাঁর যাওয়া দেখে।

পাটগোলার গেটের পাশে হিন্দুস্থানি পালোয়ানরা জমায়েত হতে শুরু করেছেন। একটু পরেই কুস্তির আখড়া শুরু হবে। খুদিদা একসময় কুস্তি অভ্যাস করেছিলেন। আমের গাড়িগুলোর একটার সামনে দাঁড়িয়ে একটু দূর থেকে পালোয়ানদের গা-ঘামানো দেখতে লাগলেন মন দিয়ে। উপেনের কথা মনে হচ্ছিল তাঁর তখন কুস্তির আখড়ার দিকে তাকিয়ে। তার চেহারা ছিল রোগার দিকে। কুস্তির আখড়ায় তালিম নিয়ে পালোয়ান হওয়ার কথা বলত মাঝে মাঝে। ভারী আজব ছেলে। তার বাবা কলকাতার লালবাজারে যোগাযোগ করে ছেলেকে খোঁজার চেষ্টা করেছে ঠিকই, কিন্তু তারিণী বসুনিয়ার পর এগতে পারেনি সাহেবদের গোয়েন্দা বিভাগ। রাজনৈতিক পরিস্থিতি বেশ উত্তপ্ত থাকার কারণে তারিণীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করতে পারছেন না তিনি। যদিও তাঁর লোক হিদারুকে টাউন থেকে বার করে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে, কিন্তু তারিণী এখন প্রকাশ্যে আসবে না।

‘আমের শেয়ার খুঁজছেন মশাই?’

একটা কণ্ঠস্বরে ঘোর কাটে খুদিদার। অচেনা একজন সাধারণ চেহারার লোক তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।

‘আমি নৌকা নিয়া আসছি। মেখলিগঞ্জ ফিরব। ভাবলাম আম নিয়া যাই দু’গাড়ি। তা সাত টাকার বেশি খরচা করতে পারব না। এরা বলতেসে, গাড়ি ভাইঙে বেচবে না। বলল, আপনি আধ গাড়ি নিবেন।’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ।’ খুদিদা ট্যাঁক থেকে টাকার থলি বার করলেন। আধ গাড়ি মানে শ’পাঁচেক আম কম করে। একা পারবে না বলে ঝাঁকাবাহী মুটে লোক ডাকতে গেল। মেখলিগঞ্জের লোকটি হাসিমুখে খুদিদাকে বলল, ‘গাড়ি বোধহয় আজই আসছে, তা-ই না? ভাল দিনে আসছি। ওখানে কম করে এক টাকা বারো আনা শ’ পাব, বুইলেন?’

লাভের অঙ্ক অনুমান করে খুদিদা মুচকি হেসে হাঁটা ধরলেন দিনবাজারের দিকে। তালেবর মিঞার ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে হরেক জিনিস পাওয়া যায়। হাল ফ্যাশনের কিছু এসেছে কি না দেখতে হবে। সুরেন কুঁড়ির বাদাম-বরফি আর নদিয়ার রসগোল্লা নিতে হবে এক সের করে। মুটেকে আম নিয়ে তালেবরের দোকানের দিকে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে এগতে লাগলেন খুদিদা। কিন্তু তালেবর মিঞার স্টোরের সামনে এসে দেখলেন সামনে একটা মোটরগাড়ি দাঁড়িয়ে। একগুচ্ছ বিভিন্ন বয়সি মানুষ গাড়িটা ঘিরে খুব নিচু গলায় মুগ্ধ চোখে আলোচনা করছে। টাউনে মোটরগাড়ি মাত্র কয়েকটা। পথে মোটরগাড়ি চললে এখনও গোরু আর কুকুররা উত্তেজিত হয়ে ধাওয়া করে।

গাড়িটা প্রসন্নদেব রায়কতের। বৈকুণ্ঠপুরের বর্তমান রাজা প্রসন্নবাবু একজন প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর উদ্যোগী পুরুষ। খুদিদা দেখলেন, প্রসন্নদেব স্টোরের ভিতরে কয়েকটা চামড়া বাঁধানো উৎকৃষ্ট নোটবুক নাড়াচাড়া করছেন। পাশে অতি বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে তালেবর। খুদিদা পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখটা পরিষ্কার করে পাপোশে পাম্প শু-র কাদা মুছে দোকানঘরে ঢুকলেন। রাজামশাই খাতা কিনছেন দোকানে দাঁড়িয়ে— এটা বেশ বিরল দৃশ্য।

খুদিদাকে দেখে তালেবর বললেন, ‘আসেন দাদা!’

প্রসন্নদেব ঘাড় ঘুরিয়ে খুদিদাকে দেখে স্মিত হেসে বললেন, ‘তালেবর আমায় বলেনি যে এমন ভাল ভাল নোটবুক এনেছে। আমি গুপ্তচরের মুখে খবর পেয়ে নিজেই হানা দিলাম।’

তালেবর লজ্জায় প্রায় দোকানের মেঝের সঙ্গে মিশে গিয়ে বলে, ‘না না!’

‘এই দুটো দাও তবে।’ প্রসন্নদেব দুটো নোটবুক আলাদা করে সরিয়ে রেখে খুদিদার দিকে তাকালেন— ‘এদিকে চিনির কল করলে আখ চাষে কেমন লাভ হবে, সে নিয়ে একটি পুস্তিকা রচনা করব ভাবছি। তারপর ধরুন করাতকল যদি বসানো যায়— রেলের স্লিপারের চাহিদা হু হু করে বাড়ছে। এসব নিয়েও কিছু লেখার বাসনা হয়েছে।’

‘আপনি নিজেও এসব নিয়ে কিছু করবেন ভেবেছেন?’

‘আপাতত পল্লিমঙ্গল সমিতি নিয়ে ভাবছি। বেলাকোবায় সমিতি চালু হয়েছে জানেন তো?’

‘ত্রিস্রোতা পত্রিকায় বিস্তারিত পড়লাম সে নিয়ে।’

‘একদিন আসুন। কথা বলি।’ নমস্কার জানিয়ে নোটবুকের প্যাকেটটা তুলে নিয়ে ধীরপায়ে বেরিয়ে গিয়ে গাড়িতে বসলেন প্রসন্নদেব। তিনিই চালক। গাড়ি গর্জন তুলে ভেজা রাস্তায় দাগ ফেলে চলে গেল। বাচ্চারা হাততালি দিল মহানন্দে।

‘কী কাণ্ড বলেন তো!’ তালেবর জলের ঘটি তুলে গলা ভিজিয়ে ধাতস্থ হয়— ‘কাল বিকেলেই খাতাগুলো এসেছে। জোসেফ সাহেব তখন দোকানে। তিনি নিলেন দুটো। উনিই বোধহয় বলেছেন প্রসন্নবাবুকে। আপনি কি নেবেন?’

‘কাল মেয়ে-জামাই আসছে।’

‘তবে আজকে না কিনে কাল জামাইকে নিয়ে চলে আসেন। আমার স্টোরে তো সে এখনও আসেনি। নিয়ে আসুন কাল।’ তালেবর হো হো করে হেসে একটা বাক্স থেকে একটা চমৎকার দেখতে ফাউন্টেন পেন বার করে বলল, ‘এটা দিয়ে কাল জামাইকে বরণ করে নিন। পিয়োর গোল্ডের নিব।’

কেনাকাটা সেরে মালপত্র তালেবরের কাছে জমা রেখে খুদিদা ঝাড়া হাত-পায়ে রাস্তায় নামলেন। বিকেলের শহর জমে উঠেছে। মনে ভারী আনন্দ বোধ করছিলেন খুদিদা। তাঁর এদিক-সেদিক উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করছিল। শোভা শ্বশুরবাড়ি চলে যাওয়ার পর সংসারে অনেক ছোটখাটো আনন্দ-ফুর্তি থেমে গিয়েছে। নিয়ম মেনে যন্ত্রের মতো চলছে বাড়িটা। সমস্যা নেই, উত্তেজনাও নেই। ডাকে আসা বইপত্রের প্যাকেটের অধিকাংশ খোলা হয় না। চা পছন্দ না হলেও চুপচাপ খেয়ে নেন তিনি। কাল থেকে বেশ কিছু দিনের জন্য আবার আগের বাড়িটাকে ফিরে পাবেন ভেবে ভারী ভাল লাগছিল খুদিদার। তিনি গুনগুন করে একটা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে হাঁটতে লাগলেন টাউন ক্লাব মাঠের দিকে।

পথে ব্রাহ্মসমাজের বাড়ি। তার লাগোয়া মাঠে বীরেন দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল একজনের। সমাজে প্রার্থনা শুরু হয়েছে। সেটা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। খুদিদাকে হেঁটে আসতে দেখে সে হাতছানি দিল। জলপাইগুড়িতে গগনেন্দ্রর জামাইবাবু সম্পর্কে তার দাদা হয়। তার সঙ্গে খুদিদার আলাপ পরিচয় হয়েছিল বিয়ের দিন। তবে খুদিদাকে সে ডাকল ভিন্ন কারণে। তার পরিবারের সঙ্গে কলকাতার লালবাজারের কয়েকজন কর্তার আলাপ-পরিচয় আছে। সেই সূত্রে উপেনের কিছু কিছু সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছে বীরেন। সে আলিপুরদুয়ার বা তার আশপাশে নেই বলেই পুলিশের ধারণা। এমনকি সে বেঁচে আছে কি না তা নিয়েও সন্দেহ করছে তারা। ডুয়ার্সের পরিবেশে ম্যালেরিয়া-কালাজ্বরের নাগাল এড়িয়ে আত্মগোপন করে বেঁচে থাকাটা অসম্ভব না হলেও প্রচুর ঝুঁকিপূর্ণ। অরণ্যে লুকিয়ে জীবনযাপন করা কার্যত অসম্ভব।

শোভা শ্বশুরবাড়ি চলে যাওয়ার পর সংসারে অনেক ছোটখাটো আনন্দ-ফুর্তি থেমে গিয়েছে। নিয়ম মেনে যন্ত্রের মতো চলছে বাড়িটা। সমস্যা নেই, উত্তেজনাও নেই। চা পছন্দ না হলেও চুপচাপ খেয়ে নেন তিনি। কাল থেকে বেশ কিছু দিনের জন্য আবার আগের বাড়িটাকে ফিরে পাবেন ভেবে ভারী ভাল লাগছিল খুদিদার।

কিন্তু এই খবরগুলো উপেনের কলকাতার বাড়িতে জানানো হয়নি। খুদিদারও নিশ্চয়ই অজানা। পুলিশ আরও খানিকটা তদন্তের পর সিদ্ধান্ত নেবে। বীরেন ঠিক করেছিল, খবরগুলো খুদিদাকে জানিয়ে রাখবে। দু’-চার দিনের মধ্যে সে নিজেই যেত খুদিদার বাড়ি।

‘কী খবর বীরেন?’ খুদিদা সামনে এসে দাঁড়ালেন। বীরেন দেখল তাঁর ঘর্মাক্ত মুখে শিশুর মতো উচ্ছ্বাস। সে কিছু বলার আগেই তিনি বললেন, ‘কাল শোভারা আসছে। জানো তো?’

‘তা-ই নাকি!’ বীরেন চোখে-মুখে উচ্ছ্বাস এনে বলল। খুদিদা এই মুহূর্তে বড় আনন্দে আছেন। এই অবস্থায় উপেনের প্রসঙ্গটা আর তুলতে ইচ্ছে করল না বীরেনের। *(ক্রমশ)*

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

স্কেচ: দেবরাজ কর

ডুয়ার্সের মেগাসিরিয়াল ২৯

লাল চন্দন নীল ছবি

অরণ্য মিত্র

ব্ল্যাক বেঙ্গলের শুভ উদ্‌বোধন পঁচিশে বৈশাখেই হচ্ছে। সেটা স্মরণীয় করে রাখতে বিশেষ কী করবেন পল অধিকারী? এসব ঠিকঠাক করার জন্য সুরেশ কুমার এসেছে দীননাথের রিসর্টে। দেবমালা যাদবের অনুরোধে কনক দত্ত সাতসকালে নেমে পড়েছেন কাজে। শুক্লা দাসের খোঁজ পেতে কী করলেন তাঁরা? সুরেশ কুমারের ফোনে মেঘ কেটে যাওয়ার খবরের পর পাঞ্জাবি তনয় সৌরভ সান্ধুর কাছে মিলনের আহ্বান নিয়ে দুপুরে অভিসারে গিয়েছিল মনামি। সেখানে যা ঘটল তা অভাবনীয়।

৮৫

পরি ঘোষালের ঘুম ভাঙল ফোনের শব্দে। সকাল সাতটাও বাজেনি। কিঞ্চিৎ বিস্ময় নিয়ে হাত বাড়িয়ে মোবাইলটা তুলে নিয়ে দেখলেন কনক দত্তর ফোন। চকিতে আলস্য কাটিয়ে কল রিসিভ করে বললেন, ‘কী ব্যাপার? সাতসকালে?’

‘আমি জলপাইগুড়িতে।’ ওপাশ থেকে কনক দত্তর গলা শোনা গেল, ‘আপনার গলিতে ঢুকে পড়েছি।’

‘সে কী মশাই! আপনি জলপাইগুড়ি চলে এসেছেন? কিছু ঘটেছে নাকি?’

‘চা রেডি করুন। গিয়ে বলছি।’

কনক দত্ত ফোন কেটে দিলেন। পরি ঘোষাল ঝড়ের গতিতে হাত-মুখ ধুয়ে নিচে নেমে দরজা খুলতে খুলতে শুনলেন বাইরে গাড়ি থামার শব্দ। কনক দত্তকে ড্রয়িং রুমে বসিয়ে পরি ঘোষাল চা আর কেক ট্রে-তে সাজিয়ে নিয়ে এসে টেবিল রাখতে রাখতে বললেন, ‘রীতিমতো সারপ্রাইজ দিলেন কিন্তু আপনি। ঘুম থেকে উঠেই বেরিয়ে পড়েছেন নাকি?’

কনক দত্ত কোনও জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে চা খেতে লাগলেন। তারপর জিজ্ঞাসু পরি ঘোষালের জিজ্ঞাসা আরও বাড়িয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলেন, ‘বিনোদ সরখেল জলপাইগুড়িতে আছে না?’

অপরাধীর বর্ণনা শুনে তার ছবি আঁকার ক্ষেত্রে বিনোদ সরখেল অসামান্য পারদর্শী। রিটায়ার করলেও ডিপার্টমেন্টে তাঁকে মাঝে মাঝে ছবি আঁকার জন্য ডেকে পাঠানো হয়। কিন্তু কনক দত্ত কেন তাঁর খোঁজ নিচ্ছে, সেটা মাথায় ঢুকল না পরি ঘোষালের। তিনি ভুরু কুঁচকে বললেন, ‘গত সপ্তাহে দেখা হয়েছিল গ্যাসের লাইনে। ফোন করব?’

‘এক্ষুনি করুন।’ একটা কেক ভেঙে মুখে চালান করে বললেন কনক দত্ত, ‘এখানে থাকলে বলুন আমরা এক ঘণ্টার মধ্যে যাচ্ছি।’

পরি ঘোষাল ফোন করলেন। বিনোদবাবু জলপাইগুড়িতে নিজের বাড়িতেই ছিলেন। কনক দত্তকে নিয়ে পরি ঘোষাল তাঁর বাড়িতে আসতে চাইছেন জেনে তিনি উৎফুল্ল গলায় বললেন, ‘আসার কী দরকার? আমি মিনিট চল্লিশের মধ্যে আপনার বাড়িতে হাজির হচ্ছি। কনকের সঙ্গে কতদিন দেখা হয় না। আড্ডা মেরে বাজারে চলে যাব।’

ফোন নামিয়ে রেখে এবার পরি ঘোষাল নড়েচড়ে বসলেন। কনক দত্তর খাওয়া শেষ হয়েছে। তিনি পট থেকে আরও খানিকটা চা পেয়ালায় ঢেলে বললেন, ‘শুক্লা দাসের নামটা মনে আছে তো আপনার?’

‘সেই কন্যাসাথি এনজিও-র স্টাফ?’

‘একদম তা-ই। তার মুখের একটা ছবি চাই। বিনোদ সরখেল থাকতে সেটা সহজেই পাওয়া যাবে। ছবি পাওয়ার পর আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।’

'শুক্লা দাসকে খুঁজতে হবে?'

'একদম!' কনক দত্ত হাসলেন, 'এই টাউনের গুপ্তচরদের আপনি ভালমতোই চেনেন। শুক্লা দাস জলপাইগুড়িতেই লুকিয়ে আছে।'

'বলছেন কী?' পরি ঘোষাল দৃশ্যত অবাক হলেন, 'এই ইনফো আপনি পেলেন কোথায়?'

এবার কনক দত্ত গতকাল-ঘটা দেবমালা যাদবের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথাটা সংক্ষেপে জানালেন। পরি ঘোষাল সেটা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন, 'শুক্লা দাস জলপাইগুড়িতে লুকিয়ে আছে জানার পরেও তাকে খোঁজার দায়িত্বটা আপনাকে দিল কেন?'

'ওদের খুঁজতে হলে পুলিশের হেল্প নিতে হত। সেটা ওরা চাইছে না। শুক্লা দাসের পাত্তা পাওয়া গেলে তার পিছনে লোক লাগিয়ে দেওয়া হবে।' কনক দত্ত ব্যাখ্যা করতে লাগলেন, 'ইন ফ্যাক্ট, ওদের টার্গেট শুক্লা দাস হলেও আসলে ওরা বুদ্ধ ব্যানার্জির কাজকর্মের হদিশ পেতে চাইছে। ব্যাপারটার সঙ্গে গর্ভমেন্টও জড়িয়ে আছে। বুদ্ধ ব্যানার্জির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার আগে গর্ভমেন্ট চাইছে সব কিছু ভাল করে গুছিয়ে নিতে। পুলিশকে জানালে তদন্তের খবর লিক হয়ে বুদ্ধ ব্যানার্জির কাছে চলে যাবেই। নোওয়ান ক্যান স্টপ। সুতরাং ভরসা হল আমি, তুমি আর সরখেলবাবু।'

'ফাটিয়ে দেব!' সহসা পরি ঘোষাল উত্তেজিত হয়ে টেবিলে একটা থাপ্পড় মারলেন, 'শুক্লা দাস যদি সত্যিই এই টাউনে লুকিয়ে থাকে, তবে আমি লোক লাগিয়ে ওকে খুঁজে বার করবই!'

অদূরে শুয়ে থাকা পরি ঘোষালের পোষা বেড়াল একবার মাথা তুলে প্রভুকে নিরীক্ষণ করল।

৮৬

একটু খইনি মুখে দিয়ে, হাত ঝেড়ে সামনে তাকাতেই দীননাথ চৌহান আশ্চর্য হয়ে গেল। এ তো সেই হারিয়ে যাওয়া স্যার! দীননাথকে খবর সংগ্রহের জন্য টাকাও দিয়েছিল। তারপর দু'-একবার ফোনে কথা হলেও আর যোগাযোগ হয়নি। তাঁর দিয়ে যাওয়া ফোটো এখনও আছে দীননাথের কাছে। ফোটোর একজনকে তো দীননাথ খুঁজেও পেয়েছিল।

'কেমন আছ দীননাথ?' স্যারের পিঠে ব্যাগ ঝুলছে। এ ছাড়া আর কোনও লাগেজ নেই। দীননাথ তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে অবাক গলায় বলে, 'আই নেভার বিলিভ! কেমন বিলং করছেন স্যার?'

'রিসর্টের তো বেশ বদল হয়েছে শুনলাম।' স্যার, অর্থাৎ সুরেশ কুমার কৌতুকের সুরে বললেন, 'ক'দিন আগে দুটো লোক এসেছিল না? তুমি তাদের কাছে আমার কথা বলে দিয়েছিলে?'

দীননাথ কাঁচুমাচু মুখে বলল, 'আই থিঙ্ক কী ওরা আপনার ফ্রেন্ড হচ্ছে। দেন আই মিসটেক। আপনি রাগ করলেন স্যার?'

'ইউ আর লাকি যে ওরা ফ্রেন্ড হয়ে গিয়েছে।' একটু উদাসভাবে বললেন সুরেশ কুমার, 'না হলে মুশকিল হত। এর পর থেকে না জিজ্ঞেস করে কাউকে কিছু বললে কিন্তু ভ্যানিশ হয়ে যাবে।'

দীননাথ চৌহান থতমত খেয়ে বলল, 'ভ্যানিশ মতলব? হু ডান ভ্যানিশ স্যার?'

'ছেড়ে দাও।' সুরেশ কুমার হাসলেন, 'তোমার ইংরিজিটা কিন্তু আগের চাইতে ভাল হয়েছে। এক্সক্লুসিভ রুম বানিয়েছ শুনলাম। সেটা খালি আছে?'

দীননাথ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ইংরিজির প্রশংসায়। তদুপরি এক্সক্লুসিভ বাংলোর কথা ওঠায় আরও আনন্দিত হয়ে বলল, 'কামিং স্যার। ফলোড বাই মি। আপনি কি স্যার ফিউ ডেজ স্টে ইন বাংলো?'

'আমাদের একটা সম্মেলন আছে পঁচিশে বৈশাখ। সেটা ভাবছি এখানেই করব।'

'সে তো ভেরি গুড দিবস স্যার। টেগোরের বার্থডে।' বাংলোর দরজার তালা খুলতে খুলতে বলে দীননাথ। তাদের রিসর্ট এখন ফাঁকা। টুরিস্টরা সব পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বৈশাখ মাসে ডুয়ার্সে বেশ গরম।

'নাইস ফর মিটিং!' বাংলোটা ঘুরে দেখে সুরেশ কুমার নিশ্চিন্ত গলায় বললেন। বুদ্ধ ব্যানার্জি স্বয়ং হাজির থাকবেন পঁচিশে বৈশাখের সম্মেলনে। সন্ধে ছ'টায় উদ্‌বোধন হবে 'ব্ল্যাক বেঙ্গল'-এর। যাত্রা শুরুর মুহূর্তকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ওই সময় ডুয়ার্সের কোথাও বিস্ফোরণ ঘটাবে পল অধিকারীর লোক।

সুরেশ কুমার মোটামুটি ঠিক করে ফেলেছেন যে, এই রিসর্টটাকেই ব্ল্যাক বেঙ্গল-এর অঘোষিত দপ্তর বানিয়ে ফেলবেন। এ নিয়ে দাসবাবু আর রঞ্জিতের সঙ্গে কথাও হয়েছে তাঁর। রিসর্ট সকলেরই বেশ পছন্দ।

'টেগোরের বার্থডেতে মিটিং করবেন, তো বুকিং করে ফেলবেন তো?' দীননাথ উৎসাহ নিয়ে জানতে চায়।

সুরেশ কুমার একটা সিগারেট ধরিয়েছেন। ফুকফুক করে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'আমি আজ থেকে তিন দিনের জন্য এখানে থাকব। তারপর টেগোরের বার্থডের আগের এবং পরের দিনটাও বুক করা দরকার।'

'হেঁ হেঁ হেঁ!' ঘোরতর ডাল সিজনে অভাবিত ছ'দিনের কমিশন চিন্তা করে আপ্লুত হয় দীননাথ চৌহান।

'হিসেব করে কত হয় জানাও। আমি টাকা এখনই দিয়ে দিচ্ছি। ক্যাশ। ভোটার কার্ডের জেরক্স আমার ব্যাগেই আছে।'

'আই অ্যাম অ্যারেঞ্জমেন্ট কুইক এভরিথিং স্যার!'

দ্রুতপায়ে আপিসঘরের দিকে হাওয়া হয়ে গেল দীননাথ। সুরেশ কুমার তার গমনের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বাংলোর চমৎকার বিছানায় চিৎ হয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন। তিন দিন এই বাংলোতে অপেক্ষা করতে হবে তাঁকে। দাসবাবু গিয়েছেন পল অধিকারীকে মিট করতে। এবার পলের সঙ্গে তাঁর দেখা হবেই। বুদ্ধ ব্যানার্জি যে তাঁকে কৌশলে এক কোটি টাকা পাইয়ে দিয়েছে, সেটা জানার পর অবশ্য পল অধিকারী নিজেই বুদ্ধ ব্যানার্জির দিকে ঢলে পড়েছে। সুরেশ কুমারের কাজ হল, পল অধিকারীর যে লোকেরা লাল চন্দন চালানের কাজে ডুয়ার্সে যুক্ত আছে, তাদের অর্গানাইজ করা। এটা করতে পারলে হাসিমারা, বীরপাড়া, গয়েরকাটা, কালচিনি লাইন দিয়ে আসাম সীমান্ত পর্যন্ত এলাকায় মাখনের মতো কাজ হবে।

তিন দিনের মধ্য কেউ একজন আসবে এ নিয়ে কথা বলতে।

৮৭

সৌরভ সান্ধু নামক পাঞ্জাবি তরুণের ফ্ল্যাটে গিয়ে দু'দিন গল্প করে এসেছে মনামি। ছেলে গলে জল। দ্বিতীয় দিন হামলে পড়েছিল মনামির শরীরে। অনেক কষ্টে বুঝিয়ে নিস্তার পেয়েছে। অনেকদিন ধরে শরীরে জমিয়ে রাখা খিদেটাকে তৃপ্তি দেওয়ার জন্য আজকের দিনটাকে বেছে রেখেছিল সে। সেই কারণে সৌরভ এখন অধীর আগ্রহে নিজের ফ্ল্যাটে সময় গুনছে। মনামি ইচ্ছে করেই নিজের মোবাইল নাম্বার দেয়নি। যে কোনওরকম গোপন কাজে ফোন খুব খারাপ জিনিস।

আজ মনামির ফুর্তি দশ গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে ঘণ্টাখানেক আগে আসা সুষমার একটা ফোন। চারপাশের গোলমাল নাকি মিটে গিয়েছে। এখন আর বাইরে বার হতে কোনও সমস্যা নেই। 'শকুন্তলা'র কাজ এক মাসের মধ্যেই শুরু হবে। শুধু তা-ই নয়, পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে কিছু টাকা সবাইকে দিচ্ছে সুরেশ কুমার। হারানো স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার কারণে উচ্ছ্বসিত মনামিকে আরও আকর্ষণীয় মনে হচ্ছিল আজকে। জাম-রঙের বারমুডার উপর হালকা লাল টপ চাপিয়ে ঠিক দুপুর দেড়টার সময় সে যখন সৌরভের ফ্ল্যাটের কলিং বেলের বোতাম টিপল, তখন তাকে দেখাচ্ছিল অপূর্ব এক মোহময়ীর মতো।

গেঞ্জি আর হাফ প্যান্ট পরা সৌরভ এক হাতে ট্যাব ধরে দরজা খুলতেই তাকে এক ধাক্কায় ভিতরে ঠেলে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করল মনামি। সৌরভের দু'চোখে মুগ্ধ দৃষ্টি। সেটা উপভোগ করে মনামি ফিসফিস করে বলল, 'তুমি কি নেটে শুধু গ্রেট ফোটোগ্রাফারদের ওয়ার্ক দেখো?'

'নো।'

'আমাকে কিছু ব্লু দেখাতে পারো?' টপটা শরীর থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আলতোভাবে ড্রয়িং রুমের সেন্টার টেবিলে ছুড়ে ফেলে বলল মনামি, 'দেন আই উইল পারফর্ম দ্য সেম অন দ্য বেড।'

এই অবস্থায় সৌরভের লাফিয়ে পড়ার কথা ছিল। কিন্তু সে আশ্চর্য সংযম দেখিয়ে বলল, 'আই অ্যাম অলসো থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্যাট। জাস্ট ওয়াচ দিস ভিডিয়ো।'

হাতে ধরে থাকা ট্যাবে আঙুল বুলিয়ে সেটা মনামির চোখের সামনে ধরল সে। সেখানে যে সাইটটা খুলছিল তা দেখে স্থির হয়ে গেল মনামি। এই পৃথিবীখ্যাত পর্ন সাইটে তার 'ঋষিকাম' রিলিজ করেছিল। এ সাইট ভারত থেকে দেখা সম্ভব নয়। সম্ভবত সৌরভের এমন কোনও ইমেল আই-ডি আছে, যা আমেরিকা বা ইউরোপের কোনও দেশ থেকে রেজিস্টার করা।

'লুক দিস গার্ল।' 'ঋষিকাম' চালিয়ে দিয়েছে সৌরভ— 'আমি কাল রাতে দেখছিলাম মুভিটা। আমার খুব ফেভারিট মুভি। আই গট স্টান্ড।'

খুব ঠান্ডা মাথায় নিজেকে সামলে মনামি বিচিত্র হাসল, 'হোয়াট ইয়োর ওপিনিয়ন? টপটা কি পরে নেব?'

'আই মাস্ট নো।' সৌরভ ট্যাবটা বন্ধ করে আলগোছে সোফার উপর ফেলে দিয়ে এগিয়ে এসে মনামির দু'কাঁধে হাত রাখল— 'আই ডোন্ট বদার ইফ মাই গার্লফ্রেন্ড ওয়ার্কস ইন পর্ন। ইউ আর অসাম!' একটা চুমু খেয়ে বলল সে, 'বাট আই উড লাইক টু বি হিরো ইন ইয়োর মুভিজ!'

'তোমার পারফর্মেন্স দেখাও!' সৌরভকে বেডরুমের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে শুরু করল মনামি। তাকে ধাক্কা দিয়ে বিছানার উপর ফেলে কোমরের উপর চড়ে বসে মাথা নামিয়ে বলল, 'তোমার মতো পর্ন গাই পেলে কী করব জানো?'

'হোয়াই ডু ইউ স্টিল হাইড ইয়োর অ্যাসেট?' মনামির বুকে হাত রেখে ভুরু নাচাল সৌরভ। ব্রেসিয়ারটা আলতো হাতে খুলে মনামি বলল, 'নাউ শোয়িং!' কিন্তু সেটা সে ফেলে দিল না। একটা কাপের পিছনে থাকা ছোট্ট পকেট থেকে দুটো ট্যাবলেটের একটা স্ট্রিপ বার করে দু'আঙুল তুলে ধরল সৌরভের মুখের সামনে।

বাথরুমে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করল মনামি। সৌরভ সান্ধুর ভাগ্য খারাপ। 'ঋষিকাম'-এর নায়িকাকে সে চিনে ফেলেছিল। তাকে খুন না করলে খবর ছড়াতে সময় লাগত না। সৌরভ সান্ধু অবশ্য বলেছিল যে, গার্লফ্রেন্ড পর্ন ফিল্মের নায়িকা হলে তার কিছু যায়-আসে না। কিন্তু মনামি জানে, সেটা সে বলেছিল তার শরীরের স্বাদ পরখ করার নেশায়। মনামি নিজেও কোনও সম্পর্ক চায়নি। শরীর তৃপ্ত হলেই সে সরে যেত সৌরভ সান্ধুর থেকে। কিন্তু 'ঋষিকাম' তখন হয়ে উঠত ব্ল্যাকমেলের হাতিয়ার।

'হোয়াট'স দ্যাট?' মনামির নগ্ন বুকের থেকে চোখ সরতে পারছিল না সৌরভ।

'ভায়াগ্রা। গিভ্‌ন বাই মাই প্রোডিউসার। এ দেশে পাওয়া যায় না।'

সৌরভের চোখ-মুখ ঝলমল করে উঠল। মনামি শান্ত হাতে একটা ট্যাবলেট বার করে তার মুখে গুঁজে দিয়ে বলল, 'মাউথ ডিসল্‌ভ।'

তারপর মনামি শুরু করল শৃঙ্গার। সৌরভ কাতর হয়ে কিছুক্ষণ আকুলিবিকুলি করল। তারপর মনামিকে জাপটে ধরে নিয়ে এল শরীরের নিচে। কিন্তু সে যেন জোর পাচ্ছিল না। কয়েকবার মনামির শরীরে উঠে দাপাদাপির চেষ্টা করল ঠিকই, কিন্তু সেসব হল নেহাত বাচ্চাদের মতো। এর পর বিছানার উপর দাঁড়াতে চাইল একবার। শেষে উপুড় হয়ে পড়ল ধপ করে। কয়েক সেকেন্ড পর দেখা গেল, সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ব্রেসিয়ারের পকেটে ঘুমের মহৌষধটা মনামি অভ্যাসের বশে ঢুকিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু আর বার করেনি। এ ওষুধ সে আগেও ব্যবহার করেছে অবাধ্য এবং বন্য কাস্টমারকে শান্ত করে দেওয়ার জন্য। কিন্তু আজকের ব্যবহারটা অন্যরকম। সৌরভ সান্ধুর ঘুমটাকে চিরকালের ঘুমে বদলে দিতে হবে এবার।

সৌরভের নগ্ন দেহটাকে চিৎ করে দিল মনামি। তারপর একটা বালিশ টেনে নিয়ে চেপে ধরল তার ঘুমন্ত মুখের উপর।

মিনিট কুড়ি পর যখন টপ এবং বারমুডা পরিহিত মনামি সৌরভের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে লিফ্‌ট বেয়ে নিজের ফ্লোরে নেমে এল, তখন তাকে খুব শান্ত কিন্তু উৎফুল্ল যুবতী বলে মনে হচ্ছিল। তাদের আবাসনে কেবল নীচতলার লিফ্‌ট এবং সিঁড়ির সামনে সিসি ক্যামেরা আছে। তাদের ফ্ল্যাটের দরজায় অবশ্য বাবা একটা ক্যামেরা নিজের উদ্যোগে বসিয়েছে। সে ক্যামেরার ছবিতে জানা যাবে যে, মনামি কখন ঘর থেকে বেরিয়েছে এবং ফিরে এসেছে। কিন্তু সে যে সৌরভের ফ্ল্যাটে এসেছিল, তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যাবে না।

বাথরুমে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করল মনামি। সৌরভ সান্ধুর ভাগ্য খারাপ। 'ঋষিকাম'-এর নায়িকাকে সে চিনে ফেলেছিল। তাকে খুন না করলে খবর ছড়াতে সময় লাগত না। সৌরভ সান্ধু অবশ্য বলেছিল যে, গার্লফ্রেন্ড পর্ন ফিল্মের নায়িকা হলে তার কিছু যায়-আসে না। কিন্তু মনামি জানে, সেটা সে বলেছিল তার শরীরের স্বাদ পরখ করার নেশায়। মনামি নিজেও কোনও সম্পর্ক চায়নি। শরীর তৃপ্ত হলেই সে সরে যেত সৌরভ সান্ধুর থেকে। কিন্তু 'ঋষিকাম' তখন হয়ে উঠত ব্ল্যাকমেলের হাতিয়ার।

এই অবস্থায় সৌরভ সান্ধুর বেঁচে থাকার কোনও অধিকার থাকতে পারে না। বস্তুত, মনামি যখন স্নান সেরে নিজের ঘরে এল, তখন তার মনে অনুতাপের নামগন্ধ ছিল না। শরীরের সাময়িক সঙ্গী বাছতে গিয়ে ভুল করে প্রায় ডুবতে যাচ্ছিল সে। এখন তার মনে সেই চাপ থেকে মুক্ত হওয়ার স্বস্তিকর অনুভূতিটাই প্রবল।

তা ছাড়া এখন সে নিশ্চিন্তে বাইরে বার হতে পারবে। একজন সাময়িক বয়ফ্রেন্ড জুটিয়ে নিতে সমস্যা হবে না। এ দেশ থেকে সাবস্ক্রাইব করা যায় না এমন পর্ন সাইটের সদস্য নিশ্চয়ই শিলিগুড়ির মতো জায়গায় অলিগলিতে ছড়িয়ে নেই।

মনামি তোয়ালে ছেড়ে বাইরে যাওয়ার পোশাক পরতে লাগল। বাঁ বুকে কিঞ্চিৎ জ্বলুনি টের পাচ্ছিল সে। নখ বসিয়ে দিয়েছিল সৌরভ। দাগটা ক'দিন থাকবে। মনামি সেই আঁচড়ের উপর ডান হাতের তর্জনীটা বুলিয়ে দিয়ে একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কে জানে! হয়ত শরীরের নিজস্ব, একান্ত চাহিদা অপূর্ণই থেকে যাবে তার। তার কর্তব্য শরীরকে অটুট রাখা। কিন্তু অন্যের চাহিদা মিটিয়ে যাওয়া এ শরীর কি কখনও নিজের জন্য আদিম খেলায় মেতে ওঠার সঙ্গী পাবে? *(ক্রমশ)*

এখন শীত থেকে বসন্ত অবধি গড়ায় ডুয়ার্সের বনভোজনের মরশুম

পিকনিকের সময় কখন? মন্তেসরির বাচ্চাও জানে উত্তরটা। গ্রীষ্মকালে যেমন চাঁদিফাটা রোদ, বর্ষাকালে বন্যা, শরৎকালে দুর্গা পুজো, হেমন্তে ধান কাটা, শীতকালে তেমনই পিকনিক। কমলালেবু, নলেন গুড় বা জয়নগরের মোয়া যদি সত্য হয়, তাহলে শীতকালে পিকনিকও সত্য। পিকনিক হল আমোদপ্রিয় বাঙালির বিলাস। তবে এই ডুয়ার্সে, যেখানে শীতের প্রলম্বিত প্রহর শেষ হতে হতেও হয় না, সেখানে বসন্তকাল অবধি গড়িয়ে যায় পিকনিকের মরশুম। এ বছর দেখা গেল, ফাল্গুন তো বটেই, চৈত্রের শুরু তেও ডুয়ার্সবাসী চড়ুইভাতি করছে চুটিয়ে। ঝালং, বিন্দু, পাপরখেতি, সামসিং, দুধিয়া, রোহিণী, গোরুবাথান, ভুটানঘাট, কালীখোলা— কোথাও বাকি নেই, ছুটির দিন এট্টু পিকনিক করার জন্য পাঁইপাঁই ছুটেছে জনতা।

ডুয়ার্সের ডায়েরি
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য

আলপিন টু এলিফ্যান্ট— সব কিছু নিয়েই রবিবাবু কিছু না কিছু লিখে গিয়েছেন। না, বনভোজনকেও ছাড়েননি। বয়স হলে যখন বনভোজন করতেই হবে, তখন ছোট থেকেই ব্যাপারটা বাচ্চাদের শেখানো ভাল— এটা মাথায় রেখে তিনি ‘সহজ পাঠ’-এর প্রথম ভাগেই তা লিখে গিয়েছেন। আজ খুব শীত, কচুপাতা থেকে টুপ টুপ করে হিম পড়ে বলতে বলতেই দেখি— আজ বুধবার, ছুটি। নুটু তাই খুব খুশি। সে-ও যাবে ফুলবনে। কিছু মুড়ি নেব আর নুন। চড়ি-ভাতি হবে। তারপর দ্বিতীয় ভাগে এসে বড়দের পিকনিকের কথা বলা হচ্ছে। শ্রাবণ মাসের বাদলা আর দিনটা বড় বিশ্রী হলেও উস্রি নদীর ঝরনা দেখতে গিয়ে একটা প্রায় বনভোজনের ব্যবস্থা করে রেখেছেন তিনি।

দু'দিন মাত্র ছুটি। কলেজের ছাত্ররা কেউ গিয়েছে ত্রিবেণী, কেউ বা গিয়েছে আত্রাই। ঝরনা দেখতে গিয়ে খোঁজ পড়ছে, সঙ্গে খাবার আছে তো? সন্দেশ আছে, পান্তোয়া আছে, বোঁদে আছে। বর্ষাকালে পিকনিক রবি ঠাকুর ছাড়া আর কেউ ভেবেছেন বলে তো মনে হয় না। কাজেই বর্ষাকালে যদি পিকনিক করা যায় তাহলে বসন্তকালে পিকনিক করা যাবে না কেন? রবিবাবুর কথা এখানেই শেষ নয়, আর-একটু আছে। কোথায় একটা যাওয়া হচ্ছে, তখন আবার খাস্তা কচুরি, পেস্তা বাদাম,

আস্ত কাতলা মাছ আর বস্তা থেকে গুনতি করে ত্রিশটা আলু চাই। এবার আলু খুব সস্তা। একান্ত যদি না পাওয়া যায়, কিছু ওল হলেও চলবে। রাস্তায় রেঁধে খেতে হবে। তার ব্যবস্থা করা দরকার। কড়া চাই, খুন্তি চাই, জলের পাত্র একটা দিতে হবে। মানে ভদ্রলোক জানতেন, পিকনিক মানেই হল একটা হইহই জিনিস।

হলিউডি সিনেমায় সাহেবসুবোদের যেটা করতে দেখা যায়, তাকে পিকনিক বলা চলে না। সেটা কিন্তু একেবারেই নিরামিষ গোত্রের। নদীর ধারে ঘাসের উপর পরিপাটি করে পাতা চেক কাটা নকশার চাদর। ম্যাপল গাছের পাতা ঝরে পড়ছে হাওয়ায়। লাঞ্চ বক্সে স্যান্ডউইচ, বার্গার, নানা রকমের ফল, আপেল জুস। সঙ্গে ব্যাডমিন্টন। এসব দেখে বাংলা সিরিয়ালের দুর্জন শাশুড়িদের মতো মুখ বাঁকিয়ে বলতে ইচ্ছে করে— হুঁঃ, যত্তসব ঢং! বাড়ি থেকে তৈরি করে খাবার নিয়ে গিয়ে নদীর ধারে বসে খাওয়া আবার কী ধরনের রসিকতা বাপু! ঘরে বসে খেলেই তো পারতিস! ওদের দেখাদেখি দিশি গেম, অন্ত্যাক্ষরি, এক হাত তাস। দুচ্ছাই, ভাবতেই গায়ে র‍্যাশ ওঠে। ওসব অ্যারিস্টোক্র্যাট জিনিসপত্তর আমাদের পোষায় নাকি! তা ছাড়া ওসব ভেজিটেবল জিনিসকে কি কেউ পিকনিক বলে? কভি নেহি। ওই লালমুখো সাহেবদের বলতে ইচ্ছে করে— পিকনিক কাহাকে বলে যদি জানিতে চাও তাহা হইলে চলিয়া আইস। আমাদের ডুয়ার্সে পদধূলি দিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া যাও পিকনিক কাহাকে বলে!

ডুয়ার্স জুড়ে পিকনিক স্পটের অভাব নেই। নদীর পাড়, পাহাড়ের মায়া, গাছের ছায়া— এসব তো আছেই, কিছু না জুটলেও অসুবিধা নেই। কেননা খোলা মাঠেও আমরা সানন্দে পিকনিক করে থাকি। কিছুই না পাওয়া গেলে নিদেনপক্ষে নিজের বাড়ি তো আছেই কিংবা এখন ফ্ল্যাটের ছাদ তো আছেই। বস্তুত, কিছুই আমরা ছাড়ি না। ছুটির দিন পেলেই হল। তিথিরও তো অভাব নেই। মহাপুরুষের জন্মদিন, মৃত্যুদিন, পুরনো বছরের শেষ দিন, নতুন বছরের প্রথম দিন, নিদেনপক্ষে শনি-রবি। গাড়ি ভাড়া করে যাওয়ার জন্য ট্যাঁকে টাকা না থাকলে অগ্রগতির শেষ গতি হল নিকটবর্তী নদীর চর। জলপাইগুড়ির লোকের যেমন আছে তিস্তা। সেখানে প্রতি বছর পিকনিকের মরশুমে তৈরি হয় তিস্তাপারের নতুন নতুন বেত্তান্ত। সদলবলে যারা যায়, তাদের কথা আলাদা, তারা অকুস্থলে রান্না করে। বাকিদের জন্য থাকে পাঁচ থাকের টিফিন বাক্সে লুচি বা পরোটা। সঙ্গে আলুর দম আর কষা মাংস। এখন হল স্মার্ট ফোনের যুগ। মেমোরি গেম না থাক, মেমোরি কার্ড আছে। পটাপট কিছু সেল্‌ফি তুলে ফেসবুকে আপলোড করে দাও। লাইকের বন্যায় ভেসে যাবে সব। সার্থক হবে পিকনিক।

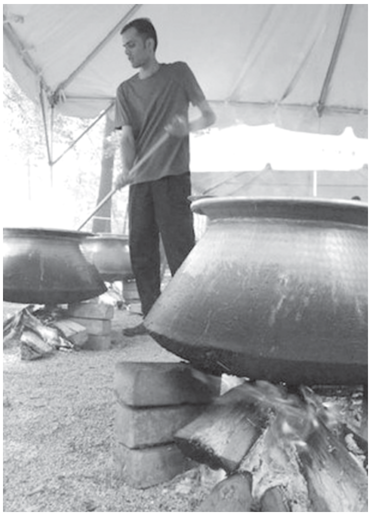

স্পটে পৌঁছেই উসেইন বোল্টের মতো দে দৌড়। ভাল দেখে স্পট বেছে নিতে হবে না? আরও অনেক পিকনিক পার্টি এসেছে যে। স্পটে পৌঁছে দেখতাম, প্যান্টের উপর গামছা পেঁচিয়ে ফিল্ডে নেমে পড়ত পাড়ার দাদারা, রান্নার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে যারা। ডেকরেটার থেকে ভাড়া করে আনা ডাবু কড়াই, নৌকো, বারকোশ, ঝাঁজরি হাতা, খুন্তি নামানো হত।

পিকনিকের নানা রকম আছে। বাড়ির পিকনিক, স্কুলের পিকনিক, অফিসের পিকনিক, পাড়ার পিকনিক, ক্লাবের পিকনিক। এবার তো দেখা গেল, এক আশ্রম বিশাল ব্যানার টাঙিয়েছে। তাদের গুরুদেবের নামে পিকনিক হবে। নাম দিয়েছে জোরদার— ভোজনোৎসব। এ ছাড়াও কিছু ঘরোয়া পিকনিক হয়, যেখানে দু'-দশজন থাকে, হাতে হাতে রান্নাবান্না নিজেরাই সেরে নেওয়া যায়। সেখানে বেসুরে গান আর পরচর্চা থাকে সাইড ডিশ হিসেবে। বাকি সব পিকনিকে অবশ্য ঠাকুর ও জোগাড়ে থাকে। রান্না হয় স্পটে গিয়ে। সেখানে নেটবিহীন ব্যাডমিন্টন, স্টেডিয়ামবিহীন ক্রিকেট, গানের লড়াই, প্রাইজ ইত্যাদি নানা রঙের অনুষঙ্গ থাকে। ইদানীং ক্যাটারারের কাছে রান্নার ভার সঁপে দেওয়ার চল শুরু হয়েছে। কোনও আলাদা হ্যাপা নেই। তারাই রাঁধবে, বাড়বে, খাওয়াবে। এ যুগে মুখেভাত থেকে শ্রাদ্ধ অবধি ক্যাটারাররা সামলে নিচ্ছে, সামান্য পিকনিকটুকু পারবে না?

তবে এর মধ্যেই আমাদের কম বয়সের কথা মনে পড়ে। স্মৃতিজীবী লোকের মতো ফোঁস করে শ্বাস ফেলে বলে ফেলি মনের দুঃখে— আহা, সে এক দিন ছিল ডুয়ার্সে। পিকনিক যাবার কয়েকদিন আগে থেকে বিবিধ কর্ম করা হত তুমুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে। স্থাননির্বাচন, দল গড়া, চাঁদা তোলা, বাজার করা, টেম্পো, বাস বা লরি ভাড়া করা— সব। ভোরবেলা জমায়েত, কলরব, নতুন খেতে শেখা সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে রওনা। যেতে যেতে গাড়িতেই ডিম, কলা, পাউরুটি। তারপর কোরাসে গান। আমাদের যাত্রা হল শুরু— 'আমাদের ছুটি ছুটি চল নেব লুটি' দিয়ে সূচনা। তারপর একবার 'উই শ্যাল ওভারকাম'। মাঝখানে কিছু হিট গান। শেষে বাংলায় ফিরে এসে— 'পথে এবার নামো সাথি'।

স্পটে পৌঁছেই উসেইন বোল্টের মতো দে দৌড়। ভাল দেখে স্পট বেছে নিতে হবে না? আরও অনেক পিকনিক পার্টি এসেছে যে। স্পটে পৌঁছে দেখতাম, প্যান্টের উপর গামছা পেঁচিয়ে ফিল্ডে নেমে পড়ত পাড়ার দাদারা, রান্নার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে যারা। ডেকরেটার থেকে ভাড়া করে আনা ডাবু কড়াই, নৌকো, বারকোশ, ঝাঁজরি হাতা, খুন্তি নামানো হত। বক্স সেট করে গান বাজানো হত। আশা ভোঁসলে, লতা মঙ্গেশকর, কিশোরকুমার। বাংলা আধুনিক বা ছায়াছবির গান। হিন্দিও চলত টুকটাক। উনুন তৈরি করা হত জ্বালানি কাঠ সাজিয়ে। প্রথমেই একপ্রস্থ চা। তারপর শিলনোড়া আর হামানদিস্তায় মশলা পেষা। পিকনিকের কনসার্ট তো এটাই।

তারপর লুচি আর সাদা আলুর তরকারি ফুরলেই কাজে নেমে পড়া। শতরঞ্চিতে বসে আলুর খোসা ছাড়ানো। কিংবা কড়াইশুঁটির দানা। সেই করতে গিয়ে বারবার চোখ চলে যায় পাড়ার মুখচোরা মিষ্টি মেয়েটার দিকে। অন্য দিকে, যে মেয়ে চোখাচুখি হলে চোখ নামিয়ে নেয়, এ দিন সে দিব্যি সোজা চোখে তাকাচ্ছে। ঈশ্বরের কী অপরিসীম মহিমা, মেয়েটির সঙ্গে কথাও তো বলা গেল দুটো। পাড়ার রুমকিবউদিই তো একটু আগে আলাপ করিয়ে দিল মেয়েটির সঙ্গে। ওই মেয়েটিকে দেখাব বলেই তো টেম্পো থেকে পিকনিক স্পটে লাফ দিয়ে নামতে গিয়ে

মচকেছে পা। এখন হাঁটতে হচ্ছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। তা হোক। বাড়ি গিয়ে না-হয় চুন-হলুদ লাগানো যাবে, কিন্তু চিত্তে প্রবল সুখ। এটুকুর বিনিময়ে মেয়েটির সঙ্গে তো বন্ধুত্ব করিয়ে দিলেন ভগবান।

এসবের মধ্যেই বেলা গড়ায় অলস গতিতে। এদিকে ততক্ষণে হালকা হাওয়ায় উড়ে বেড়াতে শুরু করেছে তেজপাতা ফোড়নের গন্ধ। মাংসের ঝোলের সুবাস। রান্না শেষ হওয়ার মুখে খবরের কাগজ পেতে দেওয়া হল মাটিতে। মাটির খুরি, লেবু, নুন। কলাপাতায় পরপর ভাত, ডাল, বেগুনি, পাঁঠার মাংস, চাটনি। পাঁপড়টা তাড়াহুড়োয় আধভাজা। এর বাইরে পাতে অবশ্য দুটো অতিরিক্ত পদ আছে— মিঠে রোদ্দুর আর মিহি ধুলো।

খেয়ে উঠে নদীর জলে হাত আঁচিয়ে দেখি, ওদিকে পাশে যে পিকনিক পার্টিটা বক্সে গমগম করে গান বাজাচ্ছিল, সেই দলের রান্নাবান্না শেষ হয়নি তখনও। কতকগুলো দামড়া এখনও উদোম নাচছে পাহাড়ি নদীর কোমর-জলে। তীক্ষ্ণ পাথরের কুচি লেগে কেটে গিয়েছে একজনের পায়ের তল। রক্ত আর জল মিলেমিশে একাকার। যার পা কেটেছে, তার পেট ভরতি লিকুইড। হ্যা হ্যা করে হাসছে, কোনও হেলদোল নেই। সে লোকটাকে জল থেকে তুলতে গিয়ে নদীতে পড়ে গেল দু'জন। কে কাকে তোলে, সবাই টাল্লি। আঁচল চাপা দিয়ে ওদের দলেরই গুটিকয়েক মেয়ে মুখ ঘুরিয়ে হাসছে। একজন এসে কানের কাছে ফিসফিস করে বলে গেল, তাড়াতাড়ি কেটে পড়ুন। ওই দেখুন, ওরাও সব চলে যাচ্ছে। জায়গাটা ভাল নয়। যে কোনও সময় স্থানীয় লোকজন ড্যাগার-কুকরি নিয়ে হামলা করতে পারে। শুনেই সকলের হাত-পা সেঁধিয়ে গেল পেটের ভিতর। ড্রাইভার এসে পড়তেই সবাই ছুট বাসের দিকে। পিকনিক স্পট ছাড়িয়ে কিছুটা এগতে নার্ভ স্টেডি হল সকলের। বয়স্করা ঝিমিয়ে আছে, গড়িয়ে পড়ছে এ ওর গায়ে। কমবয়সিরা কোরাসে গান ধরল— 'উই শ্যাল ওভারকাম'।

এখন দিন বদলে গিয়েছে। ছুটির দিনে এক-একটা দল চলেছে ম্যাটাডোর, বাসে। হুল্লোড়ে কাঁপছে ডুয়ার্স। আহ্বান যদি না-ই ধ্বনিল প্রভাত অম্বর মাঝে তাহলে আর পিকনিক কীসের? মাঠে-ঘাটে, গ্রামে-শহরে সেই তালবাদ্য। জীবন এখন অনেক সতেজ ও স্বাস্থ্যে ভরা। না, জুনিয়র হরলিক্স নয়, অ্যাডাল্ট হরলিক্স। মদীয় পিকনিকের আমোদ পরিপূর্ণ মদের গেলাসে। তৎসহ আকর্ষণ ক্যাটারিং-এর চিকেন পকোড়া, ফিশ ফিঙ্গার। সেই মৌজমস্তিতে কোনও শ্রেণিবৈষম্য নেই। আমরা সেসব বৈষম্য ওভারকাম করে এসেছি।

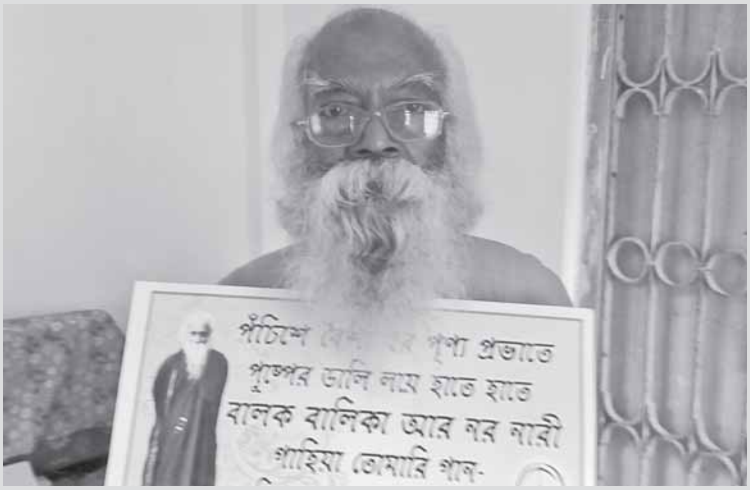
পঁচিশে পুণ্য প্রভাতে
পুষ্পের ডালি লয়ে হাতে হাতে
বালক বালিকা আর নর নারী
গাহিয়া তোমারি গান-

শিলিগুড়ির রবি ঠাকুর

শিলিগুড়ির 'রবি ঠাকুর' কবি প্রণামে যাচ্ছেন শান্তিনিকেতনে তাঁর নাম শ্যামল বসাক। কবিতা তিনি লেখেন শ্যামসুন্দর নামে। সকাল বিকেল কবিতা লেখার পাশাপাশি তিনি নিজেকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঢঙে সাজিয়ে তুলেছেন। রবি ঠাকুরের মতোই তিনি বিরাট দাড়ি রেখেছেন। রাস্তাঘাটে ছেলেমেয়েরা তাকে রবি ঠাকুর, রবি ঠাকুর বলেই ডাকতে থাকেন। তাতে তিনি এতটুকুও বিরক্ত হন না। বরঞ্চ খুইশই হন। তাঁর কথায়, 'এতে আমি গর্ব অনুভব করি। রবি ঠাকুর হওয়া তো বিরাট সাধনার ব্যাপার। কিন্তু তার মতো সেজে থাকার চেষ্টা করি বলে লোকে রবি ঠাকুর বলে ডাকে। এটা বিরাট আনন্দের।'

শিলিগুড়ি রবীন্দ্রনগর দুধ মোড় এলাকার এই রবি ঠাকুর এবারেও বিশ্ব কবির জন্মদিনে শান্তিনিকেতনে যাচ্ছেন। গতবারেও রবি ঠাকুরের ওপর স্বরচিত কবিতা লিখে বিশ্বভারতীতে গিয়ে সাড়া পান। এবারেও তাই যাচ্ছেন। আগামী পঁচিশ বৈশাখের আগেই তিনি বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছেন। তার আগে এই প্রতিবেদককে শোনালেন রবি ঠাকুরের ওপর তাঁর তৈরি করা দুটি ব্যানারের কবিতা। এই দুটি কবিতা লেখা ব্যানার তিনি বিশ্বভারতীর কবি প্রণাম অনুষ্ঠানে পেশ করবেন। এই দুটো কবিতা লেখা দুটো ব্যানার নিয়ে তিনি বিশ্বভারতীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ছুটে বেড়াবেন। যোগ দেবেন বিশ্ব ভারতীর কবি প্রণাম অনুষ্ঠানে।

৬৬ বছর বয়স্ক শ্যামসুন্দর বেশ কিছুদিন ধরে কবিতা লিখছেন। ইতিমধ্যে তাঁর একটি বই, ছন্দমালা প্রকাশিত হয়েছে। শীঘ্রই তাঁর আর একটি কবিতার বই প্রকাশিত হতে চলেছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কবিতা লেখার পাশাপাশি সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা, পরিবেশ দূষণ, ধূমপানের ওপর তিনি কবিতা লিখেছেন। পকেটে তেমন পয়সা নেই। তবুও তিনি কবিতার বই বিক্রি করেও লোকের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিয়ে কবিতার বই প্রকাশের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তবে বৃদ্ধবৃদ্ধাদের যে সমস্যা রয়েছে তার ওপর তার ইচ্ছে রয়েছে কবিতা লেখার। তিনি যেতে চান বৃদ্ধাশ্রমেও। তিনি বলেন, বর্তমান সমাজে ব্রাত্য হয়ে পড়ছেন বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা। তাদের দূর দূর করে বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছেন ছেলেমেয়েরা। ফলে বৃদ্ধবৃদ্ধাদের ওপর কবিতা লেখার দিকে তিনি এবারে ঝুঁকতে চান। শিলিগুড়িতে নিখিলবঙ্গ সাহিত্য সংস্থার তরফে কবি সুশ্বেতা বসু সহ আরও অনেকে প্রশংসা করেন শ্যামসুন্দরের কবিতার। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্রী শিলিগুড়ি নিবাসী অঙ্কিতা রায়চৌধুরীও তাঁর ওই রবি ঠাকুরের ধরনে নিজেকে সাজিয়ে তোলার প্রয়াসকে তারিফ করেন। অঙ্কিতা বলেন, 'রবি ঠাকুরকে আমরা ভুলতে বসেছি। সেখানে কেউ যদি রবি ঠাকুরের মতো নিজেকে সাজিয়ে রবীন্দ্র সংস্কৃতিকে উস্কে দিতে পারেন তবে মন্দ কি!'

বৃদ্ধ শ্যামসুন্দর এক সময় ছবি তুলতেন। কিন্তু চোখের সমস্যা হওয়ায় ছেড়ে দেন ছবি তোলার কাজ। তিনি মনে করেন, ছবি তোলার সঙ্গে একটি শিল্পীসত্তা কাজ করে। আর ভাল ছবি তোলার সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক রয়েছে। কারও যদি কবি মন থাকে আর সে যদি ভাল ফোটোগ্রাফার হতে চান, তবে তা হতে পারেন।

বিশেষ প্রতিবেদন

ডুয়ার্সের অনাদৃত রতন

লাটাগুড়ির পরান গোপ

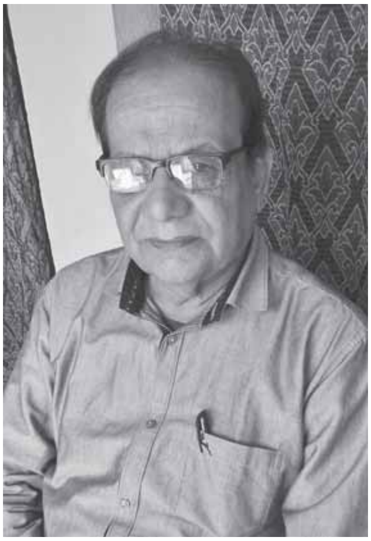

একদা গোপ পরিবার ছিল লাটাগুড়ির জমিদার। নেওড়া নদীর পাড়ে জমিদার বাড়ি এখনও আছে, তবে প্রভাব-প্রতিপত্তি শূন্য। আমার কাছে লাটাগুড়ি মানে পরান। লাটাগুড়ির লাঠি। পরানের কাঁধে চেপে বেড়ানো। সে বড় সুখের দিন ছিল— ভারী মজার। কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা। গুটিকয় দোকান নিয়ে ছিল লাটাগুড়ির বাস স্টপ। সমরের ঢকপদহীন মিষ্টির দোকান। হাটতলায় সুধীরদার হেরিটেজ আড্ডাখানা। পরানদের বাড়ি ঘেঁষে। বুধবার, শনিবার লাটাগুড়িতে হাট বসে। সপ্তাহের দু'টি দিন সুধীরদার দোকানে তখন মাছির মতো ভিড়। পরানের বাড়িতে রাত্রিযাপন করলে উষালগ্নে হাজির হতাম চা খেতে। অনেকদিন হল সুধীরদা মারা গিয়েছেন। ঝাঁপ বন্ধ। সমরের দোকানের জেল্লা বেড়েছে। আধুনিকতার ছোঁয়ায় ঝকমক করে।

লাটাগুড়ির পুরনো দিনের গল্পগাথা কত করেছি, তার হিসেব নেই। সারি সারি কাঠের দোতলা, একতলা, ছায়াময় গাছপালায়। পরম শান্ত, নির্জনতা, স্নিগ্ধ পরিবেশ অনুভূত হত। হেঁটে, ভ্যান রিকশায় বেড়াতাম। স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে ঘুঘু পাখির লাগাতার ডাক। দু'পা গেলেই গভীর জঙ্গল। ফাল্গুনে শালবনের তলা পুরু শুকনো পাতায় ভরে থাকে। কৃষ্ণচূড়া, শিমুল, দু'-একটা পলাশ ফুটত। দারুণ লাগত, শাল অরণ্যে আমি আর পরান যখন পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াতাম। এখন যেদিকে চোখ মেলি, দেখি রিসর্টের জঙ্গল। বাহারি রূপের ঝলক। চাকচিক্যটাই বেশি।

নেওড়া মোড়, নূতনপাড়া থেকে বিচাভাঙা পর্যন্ত মানুষের পদধ্বনি শোনা যায়। সাধারণ ঘরবাড়ি। দোকান-পসার কিছুই ছিল না। সন্ধ্যায় টিমটিমে ডুম জ্বলত বাতিস্তম্ভে। বিকেল থেকেই শুনশান। আমার ভীষণ ভয় করত। ভ্যান রিকশাওয়ালারা যেতে চাইত না। হাতি, বাইসন, লেপার্ডের ভয়ে। ছুটিছাটা পেলেই হল— 'চলো যাই লাটাগুড়ি।' পরানের লজ্ঝড়ে কাঠের দোতলা। সিঁড়িতে পা রাখলেই দোতলা দুলে উঠত।

—পরান আছ? বলে হাঁক দেওয়া। ঝোলাটা ঝুলিয়ে গল্পের ঝুলি খোলা।

ছেলেমেয়েরা বলত, 'জেঠু, চায়ের সঙ্গে কী খাবা?'

—তোরা যা খাস তা-ই খাব।

বলতে না বলতে পরানবাবাজি হাজির। সঙ্গে কে যে থাকত, আজ মনে পড়ে না। পরান, রতন, চঞ্চল, না হলে অসীম, তপু— কেউ না কেউ। পরান তাদের কাউকে ভিড়িয়ে দিত।

—গৌরীদা, আমি একটু অফিসের চাপটা সামলে আসি। কোনও চিন্তা নেই। এরা সব আপনার চেলা। লাটাগুড়ির চারপাশ চষে বেড়ানো। সঙ্গে রতন, চঞ্চল। উদ্দাম পা চালিয়ে বনেবাদাড়ে চরকি পাক। সেসব মনে পড়ে। লাটাগুড়ির জলছবি কিছুটা বিবর্ণ, ধূসর।

একবার অম্বরদের সঙ্গে করে পরান, বুড়িদের নিয়ে 'হোলি হ্যায়' বলে বেরিয়ে পড়া রামশাইয়ের কাছে পানবাড়িতে কালামাটির জঙ্গল হয়ে। সেই সময় লাটাগুড়িতে চার চাকার সমস্যা হল। ছাই রঙের অ্যাম্বাসাডর নিয়ে পথ চলা। খুব আনন্দ হয়েছিল। বুধুয়া, চটোয়া, কালীপুর ছিল একেবারে নির্জন। কালামাটি ছিল গভীর জঙ্গল। লাটাগুড়ির আনাচকানাচে বেড়ানো। এভাবেই হত। ধীরে ধীরে লাটাগুড়ির সঙ্গে গড়ে ওঠে আত্মিক সম্পর্ক। বলা বাহুল্য, পরানই ছিল আমার চালিকাশক্তি।

—চলেন গৌরীদা, চিকনমাটি পাখিরালয়ে।

বনসৃজন প্রকল্পের অন্যতম নিদর্শন ছিল ঘন সবুজ শিশুবন। সম্মুখে নেওড়া ও চেলের সংগমস্থল। দুই নদী পরম সোহাগে মিশেছে ধরলা নদীতে। অগণিত পাখি বাসা বেঁধেছিল চিকনমাটিতে। হঠাৎ একদিন শুনি, কাঠ-চোররা শিশু গাছের জঙ্গল সাফ করে নিয়ে চলে যায়। পাখিরাও মনের দুঃখে কোথায় উড়ে চলে যায়। বন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম, কিন্তু তাতে কোনও ফল হয়নি।

সন্ধ্যায় পরানের বাড়িতে না হলে হাটে-ঘাটে-মাঠে আড্ডা হত। নিঝুম সন্ধ্যায় কিছুই করার ছিল না। যোগাযোগব্যবস্থা ছিল ভীষণ নড়বড়ে। চিঠিপত্রই ভরসা। 'আপনজন' নামে একটি বাস সকাল ৭টায় ক্রান্তি থেকে এসে সমরদের মিষ্টির দোকানের কাছে দু'দণ্ড দাঁড়ায়, তারপর সটান শিলিগুড়ি। দ্বিতীয় বাস 'হরগৌরী'। এখন অনেক বাস। সকালে রেলগাড়ি। চ্যাংড়াবান্ধা প্যাসেঞ্জার। লাটাগুড়ি, বড়দিঘি হয়ে। অনেক কিছু লাটাগুড়িতে পাওয়া যেত না। ল্যান্ড টেলিফোন চালু হলেও মাঝে মাঝে বোবা হয়ে থাকত। পুরনো রেল স্টেশন লাটাগুড়ি তখন ভূতুড়ে বাড়ি। বারো ভূতে আড্ডা দিত। লাটাগুড়ির উন্নয়ন, স্থানীয় লোকজন, ছেলেপুলেদের বেঁচে থাকার রসদ কোথায়? কাঠ চেরাইকল বন্ধ হতে হতে টিমটিম করে চলছে। সেই সময় লিখে ফেলি লাটাগুড়ি পর্যটনের আকর্ষণ, অচেনা লাটাগুড়ি বেড়াতে চলুন। শুধুমাত্র লিখে খালাস। তারপর? টুরিস্টরা নানা জায়গা থেকে বেড়াতে আসবে। থাকবেটা কোথায়? শুরুটা পরান সামলেছিল। স্নেহভাজন বেদব্রত দত্ত লাটাগুড়ির আরণ্যক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে একটা কিছু করা দরকার বলে, দৌড়ঝাঁপ করে পিছিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত শিলিগুড়ির হেল্প টুরিজমের ছেলেপুলেরা পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করল পর্যটননিবাস কাষ্ঠ ব্যবসায়ীদের দোতলায়। পরীক্ষায় পাশ। রতন মুখুজ্জে, নাড়ুবাবু, খোকন, বাবলি, আশিস, আরও অনেকে এগিয়ে এল। সবাই বলল, ইকো টুরিজমই লাটাগুড়িকে রক্ষা করতে পারে। বাকিটুকু ইতিহাস। পর্যটনের প্রদীপ জ্বালিয়েছিল হেল্প টুরিজম। পরানের স্বপ্ন সার্থক। পরবর্তীকালে হেল্প টুরিজম গড়ে তোলে কয়েকটি ঘর। বর্তমানে যার নাম পঞ্চবটী রিসর্ট। গোরুমারা প্রকৃতিবীক্ষণের উলটো দিকে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে আরও রিসর্ট। কৃষিজমি উধাও হতে থাকে। নানা জায়গা থেকে লোকজন আসা শুরু করে। গত মাসে টেলিফোনে (নামটা উহ্য থাক) একজন দুঃখ প্রকাশ করে— গৌরীদা, লাটাগুড়িকে চেনা যায় না। রীতিমতো পার্ক স্ট্রিট। পরান, আমাদের বয়স বেড়েছে। পিছন ফিরে তাকাই যখন, হারানো অতীত ফিরে আসে। পরান ও আমি দু'জনে খাগরিজানে আমলকীবনে বসে স্মৃতি রোমন্থন করি।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস

চিত্রকথা 'ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস'। পর্ব-৭। এই চিত্রকথা কোনওভাবেই ছোটদের জন্য নয়। আর কাহিনির সঙ্গে বাস্তবের মিল খুঁজতে যাওয়া অনভিপ্রেত।

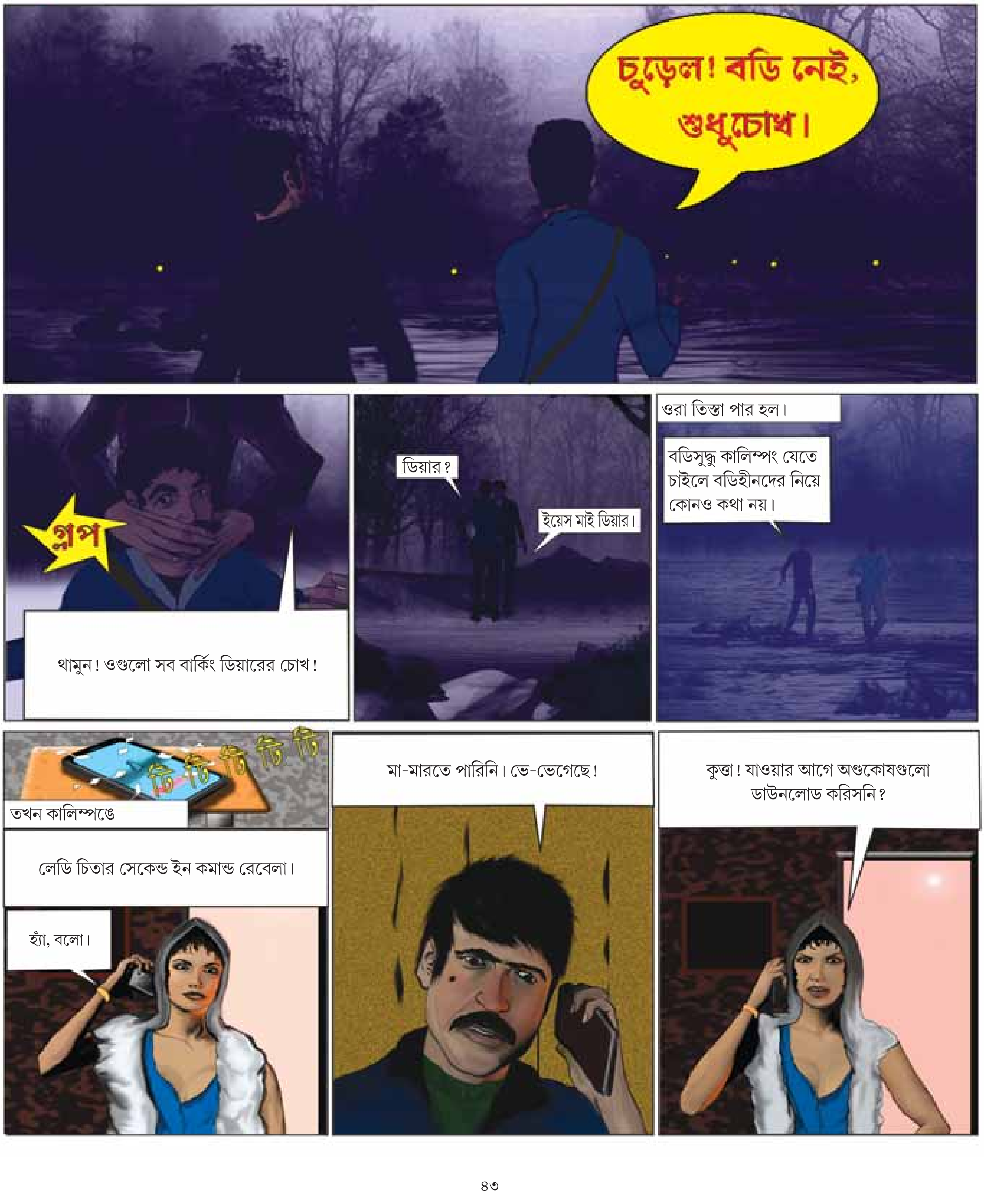
চুড়েল! বডি নেই, শুধু চোখ।
গ্লপ
থামুন! ওগুলো সব বার্কিং ডিয়ারের চোখ!
ডিয়ার?
ইয়েস মাই ডিয়ার।
ওরা তিস্তা পার হল।
বডিসুদ্ধ কালিম্পং যেতে চাইলে বডিহীনদের নিয়ে কোনও কথা নয়।
টি-টি টি টি টি
তখন কালিম্পঙে
লেডি চিতার সেকেন্ড ইন কমান্ড রেবেলা।
হ্যাঁ, বলো।
মা-মারতে পারিনি। ভে-ভেগেছে!
কুত্তা! যাওয়ার আগে অণ্ডকোষগুলো ডাউনলোড করিসনি?

EKHON DUARS, Vol-4, Issue-1 WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস

কাহিনি : বৈকুণ্ঠ মল্লিক, ছবি : দেবরাজ কর

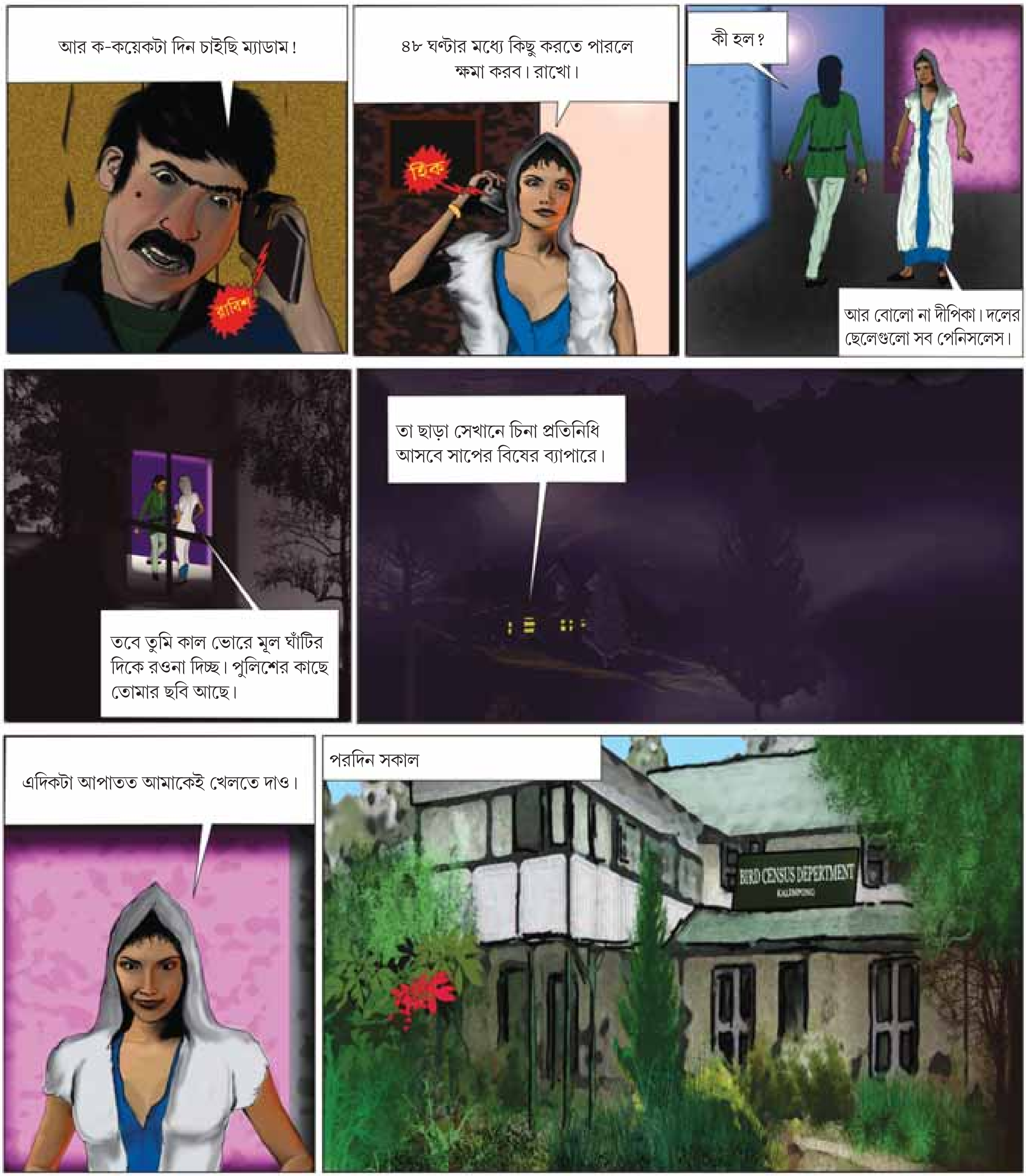
আর ক-কয়েকটা দিন চাইছি ম্যাডাম!
৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কিছু করতে পারলে ক্ষমা করব। রাখো।
কী হল?
আর বোলো না দীপিকা। দলের ছেলেগুলো সব পেনিসলেস।
তবে তুমি কাল ভোরে মূল ঘাঁটির দিকে রওনা দিচ্ছ। পুলিশের কাছে তোমার ছবি আছে।
তা ছাড়া সেখানে চিনা প্রতিনিধি আসবে সাপের বিষের ব্যাপারে।
এদিকটা আপাতত আমাকেই খেলতে দাও।
পরদিন সকাল
BIRD CENSUS DEPERTMENT
KALIMPONG

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.